Kobi by Humayun Ahmed

For More books & Muzic Visit www.MurchOna.com
Murchona forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com

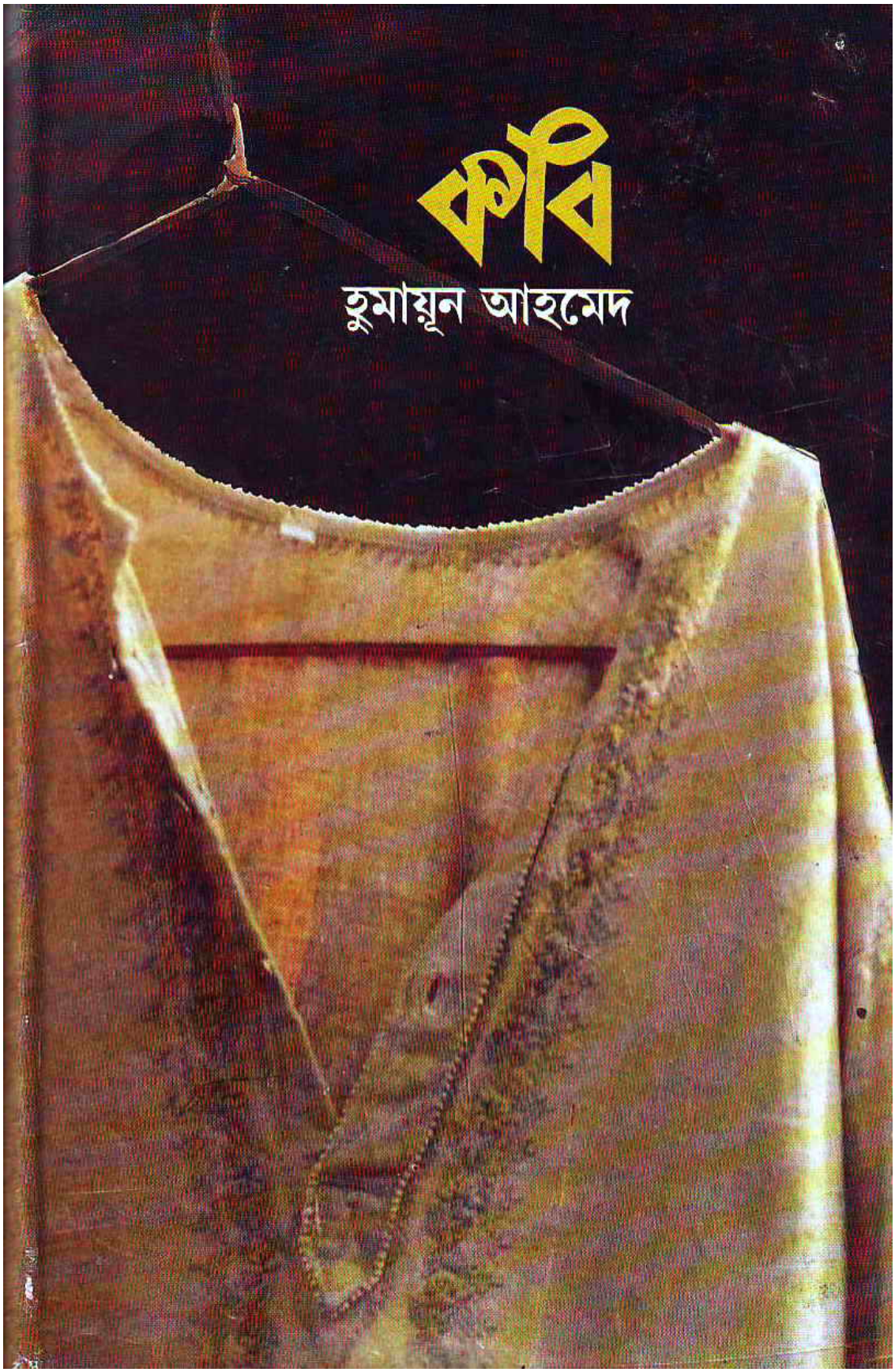
কবি
হুমায়ূন আহমেদ

কবি

'মোসাদ্দেক ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন?'

মোসাদ্দেক সাহেব বারান্দায় একটা জলচৌকির উপর বসে আছেন। ওয়েল কালারের হলুদ রঙের একটা টিউবের মুখ জ্যাম হয়ে গেছে। হাজার টিপাটিপি করেও রঙ বের করা যাচ্ছে না। তিনি বটি দিয়ে মুখটা কেটেছেন। মুখ কাটতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গেছে। ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছে। তিনি মুগ্ধ হয়ে রক্তের রঙ দেখছেন। রঙটা তাঁর কাছে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। ওয়েল কালার কি রক্তে ডিজলভড্ হবে? তাহলে তার্পিনের বদলে থিনার হিসেবে রক্ত ব্যবহার করা যেত। ওয়েল কালারে ব্যবহার না করা গেলেও ওয়াটার কালারে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা যাবে। তবে রক্তের রঙ স্থায়ী না — কিছুক্ষণের ভেতর কালচে হয়ে যায়। এতে অন্য রকম একটা এফেক্ট হতে পারে। বিভিন্ন রঙের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যেতে পারে। তার জন্যে অনেকখানি রক্ত দরকার। বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আরো কিছু রক্ত পড়লে ভাল হত। আঙুলটা আরেকটু বেশী কাটলে ভাল হত। এত কম কাটল কেন?

মোসাদ্দেক সাহেব যখন রক্ত নিয়ে এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তখনই সাজ্জাদ এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন? গভীর চিন্তায় বাধা পেলে যে-কেউ বিরক্ত হয়। মোসাদ্দেক সাহেব হন না। তিনি চিন্তাটাকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। আবার অবসর মত শুরু করেন।

'মোসাদ্দেক ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন?'

মোসাদ্দেক সাহেব বললেন, কেমন আছ সাজ্জাদ?

'জ্বি ভাল। আপনি দেখি আঙুল কেটে ফেলেছেন।'

'হুঁ।'

'অনেক রক্ত পড়েছে। এতটা কাটল কি ভাবে?'

'দা দিয়ে।'

'আপনার শরীর ভাল মোসাদ্দেক ভাই?'

'হ্যাঁ, শরীর ভাল।'

'আমার তো দেখে মনে হচ্ছে খুব কাহিলি। অসুখ-বিসুখ না-কি?'

'বেশ কিছুদিন থেকে বুকে ব্যথা হচ্ছে। মনে হয় লাংস ক্যানসার।'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

'এখনো কি হচ্ছে?'

'না।'

'আমি আপনার জন্যে দু'বোতল হুইস্কি নিয়ে এসেছি। ভালটা পেলাম না — হাতের কাছে যা পেয়েছি — এনেছি। হানড্রেড পাইপার।'

'আচ্ছা।'

তিনি এমনভাবে আচ্ছা বললেন যে খুশি হলেন কি বেজার হলেন বুঝতে পারা গেল না। আসলে তিনি রক্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা আবার শুরু করতে যাচ্ছেন।

সাজ্জাদ নিতান্ত পরিচিতজনের মত ঘরে ঢুকে পড়ল। এখানে সে অবশ্যি খুব অপরিচিতও নয়। এর আগে সে চারদিন কাটিয়ে গেছে। ঘর-দুয়ার আগে যেমন ছিল এখনো সে রকমই আছে। সেই স্টোভ, সেই থালা-বাসন। জানালায় সেই আগের রঙজ্বলা হলুদ পর্দা। দেয়ালে মাকড়সার ঝুল। মাকড়সার ঝুলের পরিমাণও স্থির। বাড়েওনি, কমেওনি। এই বাড়িটায় সময় মনে হয় স্থির হয়ে আছে। সাজ্জাদ আবার বারান্দায় এল।

'মোসাদ্দেক ভাই!'

'হুঁ।'

'কণা কি এর মধ্যে এসেছিল?'

'না।'

'ন্যুড ছবির ফরমাশ এখন আর পান না?'

'না।'

'চায়ের সরঞ্জাম কি আছে?'

'না।'

'চা খেতে চাইলে কি করেন — দোকানে বলে আসেন?'

'হু।'

'আপনার এখানে আসার আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে মোসাদ্দেক ভাই।'

'আচ্ছা।'

'উদ্দেশ্যটা হচ্ছে — আমার একটা ন্যুড পোর্ট্রেট দরকার। আপনি পোর্ট্রেটের জন্য কত নেন?'

'চার হাজার।'

'আমি আপনাকে চার হাজারের অনেক বেশি দেব। আমাকে ভালমত এঁকে দিতে হবে।'

'আচ্ছা পোর্ট্রেটটা কার — কণার?'

'না। কণার না। তবে কণাকে আপনি মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যার পোর্ট্রেট সে কখনো মডেল হবে না।'

'আচ্ছা। ঐ মেয়েটির মুখের ছবি লাগবে। বড় ছবি। সামনাসামনি ছবি এবং প্রোফাইলের ছবি।'

'আমি জোগাড় করে দেব। একটা ছবি শেষ করতে কতদিন লাগে?'

'আমি দ্রুত কাজ করি। সময় লাগে না। ধর এক সপ্তাহ। তবে ভাল করে আঁকতে সময় লাগে।'

'আপনি সময় নিন। কিন্তু খুব ভাল করে আঁকবেন। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কি রকম হবে আপনাকে বলে দেব?'

'দাও। আমি ফরমায়েশী কাজই করি। নিজের ইচ্ছায় কিছু আঁকি না।'

'মনে করুন একটা নির্জন বন। সাধারণ বন না — কদম্ব বন। বর্ষাকাল। গাছ ভর্তি কদম ফুল ফুটেছে। কদম্ব বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা পুকুরের পাড়ে মেয়েটি নাচছে। আপন মনে নাচছে। যেহেতু চারপাশে কেউ নেই সেহেতু মেয়েটি তার নগ্ন শরীর নিয়ে চিন্তিত নয়। আমি কি দৃশ্যটা আপনাকে বুঝাতে পেরেছি?'

'হুঁ। ছবির সময়টা কি?'

'সন্ধ্যা। গাছের মাথায় সন্ধ্যার শেষ আলো পড়েছে।'

'আকাশ দেখা যাচ্ছে?'

'না। তবে পুকুরের জলে আকাশের ছায়া পড়েছে।'

'জটিল ছবি। আঁকতে সময় লাগবে।'

'আপনি সময় নিন। আমার কোন তাড়া নেই। আপনি চার হাজার চেয়েছেন — আমি দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছি। টাকাটা কি এখন দেব?'

'দাও।'

সাজ্জাদ টাকা বের করে দিল। মোসাদ্দেক সাহেব টাকা হাতে নিলেন। দু'বার গুনলেন। তারপর পাঞ্জাবি গায়ে বের হয়ে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন সাজ্জাদকে বলে গেলেন না। তাঁর বুড়ো হাতের আঙুলের রক্ত আবার ফোটা ফোটা পড়তে শুরু করেছে। মোসাদ্দেক সাহেবের ভুরু কুঁচকে আছে। এক নাগাড়ে অনেকখানি রক্ত পড়লে ভাল হত। এক্সপেরিমেন্টটা করা যেত। শুধু শুধু রক্তটা নষ্ট হচ্ছে।

সাজ্জাদ রাত দু'টায় লীলাবতীকে টেলিফোন করল। লীলাবতী ঘুমুচ্ছিল। সে টেলিফোন ধরল আধো-ঘুম ও আধো-তন্দ্রায়।

'হ্যালো, কে?'

'আমি সাজ্জাদ — তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?'

'হুঁ।'

'ঘুম ভাঙালাম?'

'হুঁ।'

'দুঃখিত লীলাবতী।'

'দুঃখিত হবার দরকার নেই। কেন টেলিফোন করেছেন?'

'তুমি ঘুমুচ্ছ না জেগে আছ, এটা জানার জন্যে।'

'যা জানার তা তো জেনে গেছেন। এখন কি টেলিফোন রেখে দেবেন?'

'না, কিছুক্ষণ গল্প করব। আমার ঘুম আসছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'আমার কথা মনে পড়ল?'

'ঠিক তাও না। তুমি তোমার টেলিফোন নাম্বার দেয়ালে লিখে রেখে গিয়েছিলে। চোখের সামনে নাম্বারটা জ্বলজ্বল করছে।'

'দেয়াল নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত।'

'জন্মদিনের পার্টি থেকে যে ঘাড় ধরে বের করে দিলে তার জন্যে দুঃখিত না?'

'না। আমি খুব খুশি হব যদি আর কখনো আমাদের বাড়িতে না আসেন।'

'আচ্ছা আসব না। দেয়ালে লেখা টেলিফোন নাম্বারটা কি মুছে ফেলব?'

'না, এটা থাকুক। এই নাম্বারটা ঘুমের অষুধ হিসেবে ব্যবহার করবেন। ঘুম না এলে টেলিফোন করবেন।'

'টেলিফোন করলে অসুবিধা নেই?'

'না, তাতে অসুবিধা নেই। দূর থেকে আপনি চমৎকার মানুষ। কাছ থেকে না। খুব কাছ থেকে যে আপনাকে দেখতে যাবে সেই একটা শক্ খাবে।'

'আমার নিজেরো তাই ধারণা। আচ্ছা শোন লীলাবতী, তোমার নাচ বিষয়ে একটা কথা।'

'নাচ প্রসঙ্গ থাক। অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করুন — '

'সামান্য একটা প্রশ্ন। এক অক্ষরে জবাব দেয়া যায় এ রকম।'

'প্রশ্নটা কি?'

'তুমি কি সম্পূর্ণ নিজের আনন্দে একা একা কখনো নাচ? মানুষ যেমন একা একা গান গায় সে রকম?'

'হ্যাঁ, নাচি।'

'এখন বল একা একা যখন নাচ তখন কি সামনে কাউকে কল্পনা করে নিতে হয়?'

লীলাবতী চুপ করে রইল। সাজ্জাদ আগ্রহের সঙ্গে বলল, চুপ করে আছ কেন? বল।

লীলাবতী নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ, কল্পনা করে নিতে হয়।

'কাজেই চিন্তা করে দেখ নৃত্যকলা এমন এক বিদ্যা যা সৃষ্টি হয়েছে অন্যের জন্যে। গান কিন্তু নিজের জন্যেও।'

'নৃত্যকলা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কি তোমার কয়েকটা ছবি আমাকে দেবে?'

'কি দেব?'

'ছবি। ফটোগ্রাফ।'

'কেন?'

'আছে, আমার একটা কাজ আছে। তিনটা ছবি — একটা সামনে থেকে, দু'টা

প্রোফাইল। লেফট প্রোফাইল এবং রাইট প্রোফাইল।'

লীলাবতী গম্ভীর গলায় বলল, কেন চাচ্ছেন আগে বলুন।

সাজ্জাদ বলল, আগে বলব না। আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। ভাল থেকো।

ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করছে। ভয়ংকর কিছু। ঈশ্বর মানুষকে ভয়ংকর কাণ্ড করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠান কিন্তু বার বার বলে দেন — "তোমরা ভয়ংকর কিছু করো না। সাবধান, সাবধান, সাবধান।" তিনি যদি চাইতেন মানুষ ভয়ংকর কিছু করবে না তাহলে তাদের সেই ক্ষমতা না দিলেই পারতেন। তাদের প্রজাপতি বানিয়ে পাঠালেই হত। তারা রঙ্গিন পাখা মেলে ফুলে ফুলে উড়বে। কোনদিন ভয়ংকর কিছু করতে পারবে না।

সাজ্জাদ হাত বাড়িয়ে এডমন্ড স্পেনসারের কবিতার বই টেনে নিল। কোন বাছাবাছি না। বই খুললে প্রথম যে কবিতাটি বের হবে সেটাই পাঠ করা হবে। পাঠ এবং তাৎক্ষণিক অনুবাদ। লীলাবতী পাশে থাকলে ভাল হত। তাকে বলা যেত — লীলা তুমি হাতে কলম নাও। নাচের মুদ্রার মত কলমটা ধর যেন এটা কলম না, এটা একটা পদ্মফুল। তারপর আমি যা বলব তুমি লিখে ফেলবে। কবিতার পালা শেষ হলে নাচ হবে — তুমি নাচবে আমি দেখব। ঘরে বাতি থাকবে না। তুমি নাচবে অন্ধকারে আমি অন্ধকারেই তোমাকে দেখার চেষ্টা করব। পৃথিবীর প্রকৃত রূপ লুকিয়ে থাকে অন্ধকারে। কারণ কল্পনার জন্ম অন্ধকারে, পরাবাস্তবে। সাজ্জাদ বই খুলল —

"Unhappy verse, the witness of my unhappy state,"

লীলাবতী তাড়াতাড়ি লেখ —

"অসুখী পংক্তিমালা, দেখো দেখো আমার অসুখ দেখো"

হচ্ছেনা অসুখী পংতিমালা অসুখ দেখবে না সে অসুখের সাক্ষি হবে। তাছাড়া পংক্তিমালা কখনো অসুখী হয় না . . . এডমন্ড স্পেনসার সাহেব এইসব কি হাবিজাবি লিখছেন?

বরিশালের ছায়াময় শহরের জীবনানন্দ দাস কি বলেন?

"নির্জন আমের ডালে দুলে যায় — দুলে যায় — বাতাসের সাথে বহুক্ষণ
শুধু কথা, গান নয় — নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন।"

মন্দ না — "নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন।" এক আশ্চর্য নীরবতা আমাদের ভেতর অথচ আমরা বাস করি সরব পৃথিবীতে। এক আশ্চর্য অন্ধকার আমাদের ভেতর — অথচ আমরা বাস করি আলোর ভুবনে। মাতৃ জঠরের অন্ধকারের স্মৃতি মাথায় নিয়ে আমরা আলোর আরাধনা করি। উল্টোটা করাই কি যুক্তিযুক্ত না?

সাজ্জাদ ড্রয়ার খুলল। তার পা টলছে, হাত কাঁপছে তাকে কেমন যেন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। অথচ সে কোন নেশা করেনি। এখন করবে। আফিং-এর একটা ডেরিভেটিভ

শরীরে ঢুকিয়ে দেবে। মরফিনকে এসিটিক এনহাইড্রাইড দিয়ে মিশিয়ে যে বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে যার নাম হেরোইন। হেনরিখ ড্রেসার সাহেবের মহান (?) আবিষ্কার! যখন প্রথম তৈরি করা হল তখন পৃথিবীর প্রথম সাড়ির বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন — এটি একটা বড় ধরনের আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ব্যবহৃত হবে মানব কল্যাণে। আজ উল্টোটা হয়েছে। হেনরিখ ড্রেসার সাহেব ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরি করেছেন।

সাজ্জাদ শাদা পাউডারের দ্রবণ তৈরি করল খুব সাবধানে। পাকা কেমিষ্টের মত। হাইপারডারমিক সিরিঞ্জে দ্রবণটা ঢুকাল। এই কাজটিও করা হল নিখুঁতভাবে। এখন শুধু শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া — ব্যাপারটা দু'ভাবে করা যেতে পারে। চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া, কিংবা সরাসরি কোন রক্তবাহী শিরায় ঢুকিয়ে দেয়া। রক্তে ঢোকার সঙ্গে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠবে। প্রচণ্ড একটা ঝড় শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। শরীরের প্রতিটি জীবকোষ এক সঙ্গে নেচে উঠবে।

লীলাবতী তুমি কি এই নাচের খবর জান? না, তুমি এই নাচের খবর জান না। এ এক অদৃশ্য নাচ।

তারপরের সময়টা নৃত্যক্লান্ত নর্তকীর অবসাদের মত। সে অবসাদও আনন্দময় অবসাদ। এক ধরনের মুক্তি। সরব পৃথিবী থেকে মুক্তি, আলো থেকে মুক্তি। উল্টো যাত্রা।

'If in bed, tell her that my eyes can take not rest ;
If at board, tell her that my mouth can eat no meat ;
If at her virginals, tell her I can hear no mirth.'

এটা কার কবিতা? কে আবৃত্তি করছে? সাজ্জাদ কুণ্ডুলি পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে শীতল হাওয়া আসছে। শীত লাগছে। শরীর কাঁপছে। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। যিনি কবিতা আবৃত্তি করছেন তার কণ্ঠ ভরাট। কে এই ভদ্রলোক কে? ঘরে বাতি জ্বলছে। বাতির আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। কি সুন্দর করেই না আলো কমছে। আহ্ অন্ধকারের দিকে যাত্রা এত আনন্দময়?

সাজ্জাদ চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বলল, লীলাবতী এসো, তুমি এসো। বিছানায় উঠে এসো। না আমাকে স্পর্শ করার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু তাকিয়ে থাক আমার দিকে — আমি তাকিয়ে থাকব তোমার আশ্চর্য সুন্দর চোখের দিকে। তুমি জান তোমার চোখের দিকে তাকালে আমি কি দেখি? "I can see the universe." তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে? তোমার চোখ দু'টা আমাকে দিয়ে দেবে? তোমার শরীর তোমারই থাকুক। সেই শরীর নিয়ে যত ইচ্ছা তুমি নেচে বেড়াও শুধু চোখ দু'টা আমাকে দিয়ে দাও। আমি একটা হরলিক্সের কৌটায় দু'টা চোখ রেখে দেব। না চোখ নষ্ট হবে না। আমি ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখব। তুমি কি জান ফরমালিন কি? ফরমালিন হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ফরমালডিহাইডের দ্রবণ।

এর রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে — HCHO

সাজ্জাদ নিজের মনেই হাসল। ঘরের আলো আরো কমে আসছে — সুন্দর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কে এসেছে ঘরে? লীলাবতী? তার কি হেলোসিনেশন হচ্ছে? মরফিন ডিরিভেটিভের কি হেলোসিনেটিং এফেক্ট আছে? সাজ্জাদ বিড় বিড় করে বলল, এসো লীলাবতী, এসো ! !

সুন্দর একটা গান ছিল না ঘরে আসা নিয়ে? "এসো আমার ঘরে এসো. . . " এই জাতীয়। গানের সুর মাথায় আসছে, কথা আসছে না। আবার যখন কথা মনে আসছে তখন সুর মনে আসছে না। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের মত। যখন গতি জানা যায় তখন অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দু'টি অনিশ্চয়তার গুনফল সমান 'h' প্ল্যাংক কনসটেন্ট। এই ভদ্রলোক ১৯০৫ সনে জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ বলেছিলেন — আচ্ছা মাথার মধ্যে অংক ঘুরছে কেন? গান কোথায় গেল? গান?

"এসো আমার ঘরে. . ."

মিলির বিয়ে বেশ স্বাভাবিকভাবে হয়ে গেল। বাঙালী বিয়ে যেভাবে যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবেই হল। গায়ে-হলুদে মাছ পাঠাল বরের বাড়ি থেকে। সেই মাছ সাইজে প্রকাণ্ড হল না। মাঝারি সাইজের কাতল। মিলির মামি বললেন, মনে হচ্ছে ফকিরের পুলা। সরপুটি পাঠিয়ে দিয়েছে।

মিলির দুঃখে কান্না পেতে লাগল। এখনো বিয়ে হয়নি তারপরেও বরপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য তার গায়ে লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে মাছটা তো বেশ বড়ই লাগছে। এরচে' বড় মাছের দরকার কি?

বিয়েতে আনা গয়নাগাটি নিয়ে খুব হাসাহাসি হতে লাগলো। মিলির দূর সম্পর্কের এক বোন গলার হারটা নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের সামনে ধরে হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ে গেল।

'কি রকম পাতলা দেখেছ? গয়নার ভেতর দিয়ে লাইট পাস করছে।'

মিলিকে মুখ হাসি হাসি করে রাখতে হচ্ছে, নয়ত সবাই ভাববে কথাগুলি সে গা পেতে নিচ্ছে। সে মুখ হাসি হাসি করে রাখল। তবে মনে মনে বলল, লাইট তোর মোটা মাথা দিয়ে পাস করছে — হাঁদিরাম কোথাকার।

বরকে নিয়েও অনেক হাসাহাসি হল। অপরিচিত সুন্দরমত একজন মহিলা বললেন, বর দেখেছ? হাতভর্তি গরিলার মত লোম। এই ভদ্রলোকের শীতকালে কোন কম্বল লাগবে না। ন্যাচারেল উলেন কম্বলে গড অলমাইটি উনাকে ঢেকে দিয়েছেন। এই জাতীয় কুৎসিত কথাতেও মিলিকে অন্যদের মত হাসতে হল। সে লক্ষ্য করল, সবাই হাসছে, শুধু তার দুই ভাই মুখ কাল করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচে' তাকে যে ব্যাপারটা কষ্ট দিল তা হচ্ছে আতাহারের চোখে পানি ছল ছল করছে। ভাইয়া কখনো কাঁদে না। বাবার মৃত্যুর দিন সবাই হাউমাউ করে কেঁদেছে, ভাইয়া কাঁদেনি। মনে হচ্ছে আজ বোনের অপমানে সে কেঁদে ফেলবে।

মিলি মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগল। হে আল্লাহ! ভাইয়া যেন কেঁদে না ফেলে। ভাইয়া যেন কেঁদে না ফেলে। ভাইয়া কেঁদে ফেললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না। মিলি মনে মনে আতাহারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার মন বলছে, মনের কথাগুলি কোন না কোনভাবে ভাইয়ার কাছে পৌঁছে যাবে। মনে মনে কথা বলার এই কৌশল আল্লাহ মানুষকে যখন দিয়েছেন তখন কোন উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছেন। শুধু শুধু

তো দেননি। মিলি বলতে লাগল —

'ভাইয়া তুই এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বিয়ে হচ্ছে ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ পৃথিবীতে জোড়া মিলিয়ে মানুষ পাঠান। যার যেখানে বিয়ে হবার সেখানেই হয়। আমার এই মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হবার ছিল বলেই হচ্ছে। মানুষটার গাভর্তি গরিলার মত লোম থাকলেও কিচ্ছু করার নেই। মানুষের চেষ্টায় যদি কিছু হত তাহলে তো বড় আপু আমেরিকায় যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিল তার সঙ্গেই বিয়ে হত। আমি তো রাজিই ছিলাম। ছেলেটা আমাকে দেখে পছন্দ করে গেছে। তারপর দু'দিন পর অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাদের খবর দেবারও দরকার মনে করেনি। এই ছেলের গাভর্তি লোম থাকুক বা না থাকুক, সে তো আমাকে এরকম অপমান করেনি। ভাইয়া, আমি এই ছেলেকে আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে ভালবাসব। তুই দেখিস আমি কত সুখী হব। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে হবে আমার। তুই যখন আমাকে দেখতে যাবি তখন তারা 'মামা মামা' বলে তোর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুই হাসতে হাসতে কপট বিরক্তিতে বলবি, মিলি, তোর বাচ্চাগুলি তো দুষ্টের শিরোমণি হয়েছে। না, তোদের বাসায় আর আসা যাবে না।

ভাইয়া, আমাদের সংসারটা ভেঙে গেছে। আমাদের খুব সুন্দর সংসার ছিল। বাবা গেলেন মরে। মা'র এখন আর কোন হুঁশ-জ্ঞান নেই। তুই আর ছোট ভাইয়া আশ্রিতের মত অন্যের বাড়িতে আছিস। আমি জানি, এইসব তোর গায়ে লাগে না। কোন কিছুই তোর গায়ে লাগে না। তুই ফুটপাতেও চাদর গায়ে দিয়ে জীবন পার করে দিতে পারবি। কিন্তু আমার খুব লাগে। আমি রাত-দিন কি প্রার্থনা করি জানিস? আমি রাত-দিন প্রার্থনা করি — যেন তোর একটা বিয়ে হয়। ভেঙে যাওয়া সংসার আবার জোড়া লাগে। কোন এক ছুটিছাটায় আমি আমার স্বামী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে তোর বাড়িতে উপস্থিত হব। আমরা খুব হৈ-চৈ করব। সেকেন্ড শোতে ভাবীকে নিয়ে আমি সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যাব। আমার বরকে সঙ্গে নিতে হবে, নয়ত টিকিট কাটবে কে? তাছাড়া অত রাতে আমরা দু'জন মেয়ে মানুষ তো আর ফিরতে পারব না। তুই বাসায় বসে তোর ভাগ্নে-ভাগ্নিকে নিয়ে খেলবি। গল্প বলে ওদের ঘুম পাড়াবি?

বিয়ে হয়ে গেল। কনেকে স্বামীর হাতে তুলে দেবার একটা অনুষ্ঠান আছে। মিলির বড় মামা এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন। মিলি ক্ষীণ গলায় বলল, মামা, ভাইয়াকে আসতে বলুন। এই কাজটা ভাইয়া করুক। মিলির বড়মামা মিলির কথায় আহত হলেন, তবে আতাহারকে ডেকে নিয়ে এলেন। রাগী গলায় বললন, বোনের হাত ধর। হাত ধরে ছেলের হাতে তুলে দাও।

আতাহার মিলির হাত ধরল।

মিলির বড়মামা বললেন, হাত ধরে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বল, আমার বোনকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে সুখে রাখবেন।

আতাহার বলল, আমার বোনকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে আপনি

সুখে রাখুন বা না রাখুন সে আপনাকে সারাজীবন সুখে রাখবে।

মিলি দেখল, আল্লাহ তার প্রার্থনা শুনেননি। আতাহার কাঁদছে। ছোট বাচ্চাদের মত ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে।

মিলির ইচ্ছা করছে ভাইয়াকে বুকে চেপে ধরে বলে, কি করছিস তুই ! কান্না বন্ধ কর তো, কান্না বন্ধ কর।

সে কিছুই বলতে পারল না। অপরিচিত একটা ছেলের হাত ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিলি তার স্বামীর কর্মস্থল ঠাকুরগাঁয়ে চলে যাচ্ছে। মিলির স্বামী মোঃ জহির উদ্দিন ঠাকুরগাঁ পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার। মিলি ট্রেনে জানালার পাশে বসেছে। নতুন বউদের মাথাভর্তি ঘোমটা থাকার নিয়ম। মিলির মাথায় ঘোমটা নেই। সে জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকিয়ে আছে। প্ল্যাটফরমে আতাহার ও ফরহাদ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছাড়তে এখনো দেরি আছে। তারা ট্রেনের জানালার কাছে এসে গল্প করতে পারে, তা করছে না। চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করলেও হত। তাও করছে না। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কেউ কাউকে চেনে না। দু'জন অপরিচিত মানুষ কি এমন ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকে? আতাহারকে সাধারণ একটা শার্ট-পেন্টে কি সুন্দর লাগছে। ! ফরহাদকে লাগছে না। সে এমন কুঁজো হয়ে আছে কেন? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না?

জহির উদ্দিন জানালার কাছে এসে বলল, মিলি, ট্রেন লেট হবে। তুমি চা খাবে?

মিলির হাসি পেয়ে গেল। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে কাল রাত থেকেই তার হাসি পাচ্ছে। কিভাবে সে স্ত্রীর সেবা করবে, যত্ন করবে তা নিয়ে অতি ব্যস্ত। ব্যস্ততাটা যে খুব হাস্যকর লাগছে তাও লোকটা বুঝতে পারছে না।

তাদের বাসর হয়েছে জহির উদ্দিনের খালাতো বোনের বাড়িতে। রাত একটার দিকে জহির ব্যস্ত হয়ে বলল, মিলি, তোমার কি মাথা ধরেছে? বলেই সে পাঞ্জাবির পকেট থেকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বের করল। তার স্ত্রীর মাথা ধরবে এই ভেবে লোকটা কি আগে থেকেই পাঞ্জাবির পকেট ভর্তি করে মাথাধরার অষুধ নিয়ে বসে ছিল?

মিলি বলল, মাথা ধরবে কেন?

'তুমি ভুরু কুঁচকাচ্ছ এই জন্যে বললাম। সারাদিনের টেনশানে মাথা ধরা তো স্বাভাবিক। আমার কখনো মাথা ধরে না। সেই আমারই মাথা ধরে গেছে।'

'না, আমার মাথা ধরেনি।'

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সে বলল, মিলি, তুমি খাটের কোনদিকে ঘুমুতে পছন্দ কর?'

'মিলি বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'অনেকে খাটের দেয়ালের দিকে শুতে পারে না — এ জন্যে জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা তুমি বরং বাইরের দিকে শোও — বাতাস বেশি পাবে। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগবে।'

মিলি মনে মনে হাসল। জহির উদ্দিন বলল, বাসররাতে নিয়ম হল সারারাত বাতি

জ্বালিয়ে রাখা। তুমি কি এই নিয়মটার কথা জান?'

'জানি।'

'নিয়মটা কোত্থেকে এসেছে জান?'

'বেহুলাকে সাপে কাটার পর থেকে এসেছে।'

'ঠিক বলেছ তো। মিলি, আলো জ্বালা থাকলে কি তোমার অসুবিধা হয়?'

'আমার কোন কিছুতেই অসুবিধা হয় না।'

'বিসকিট খাবে মিলি?'

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, বিসকিট খাবো কেন?

'আমি খবর নিয়েছি রাতে তুমি ভাল করে খাওনি। এই জন্যে বিসকিট এনে রেখেছি। খাবে? ভাল বিসকিট। দু'টা বিসকিট খেয়ে একগ্লাস পানি খাও।'

মিলির বিসকিট খাওয়ার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। শুধু লোকটার আগ্রহ দেখে বলল, আচ্ছা। বিসকিট এবং পানি খাওয়া হল।

জহির উদ্দিন বলল, তোমার ঠোঁটে বিসকিটের গুড়া লেগে আছে। দাড়াও মুছে দিচ্ছি। সে হাত দিয়ে মুছে দিল। মিলি মনে মনে হাসল। ঠোঁটে হাত দিতে ইচ্ছে করছে — হাত দিলেই হয়? এত ফন্দি কেন?

জহির উদ্দিন বলল, পান খাবে? পান খেলে মুখের মিষ্টি ভাবটা কাটা যাবে।

'পানও কি আপনার পাঞ্জাবির পকেটে?'

'না, ড্রয়ারে রেখেছি। স্টেডিয়াম থেকে এনেছি। স্টেডিয়ামে একটা পানের দোকান আছে — খুব ভাল পান বানায়।'

দু'জন দু'টা পান খেল। মানুষটার চেহারা মিলির মোটেই ভাল লাগছিল না। কি রকম বিশাল গোলাকার একটা মুখ! ঠোঁটের নিচে ফিনফিনে গোঁফ। কানগুলি ছোট ছোট। দাঁত ছোট ছোট — হাসলে কালো মাড়ি বের হয়ে পড়ে। তারপরেও গভীর রাতে লোকটার খুশি খুশি মনে পান খাওয়া দেখতে দেখতে মিলির মনে হল — লোকটা তো দেখতে খারাপ না। চেহারার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা ভালমানুষী লুকিয়ে আছে। বিশাল শরীরের ভেতর লুকিয়ে আছে লাজুক ধরনের ছোট্ট একটা শিশু। মিলির ইচ্ছা করতে লাগল সে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। যেন লজ্জা ভেঙে লোকটা তার হাত ধরতে পারে। লোকটার লজ্জা আবার বেশি বেশি। এখনো স্ত্রীর হাত ধরেনি। শুধু একটা ফন্দি করে একবার ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়েছে।

এই যে এখন জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চা খাবে কিনা মিলিকে জিজ্ঞেস করছে। লোকটার আসল উদ্দেশ্য জানালা ধরার অজুহাতে মিলির হাত ছুঁয়ে দেয়া। মিলির দু'টা হাতই জানালায়। মিলি বলল, আমি চা খাব না, তুমি দেখ, ভাইয়ারা খাবে কিনা।

কত সহজে মিলি ভোরবেলা থেকে মানুষটাকে তুমি ডাকছে। যতবারই ডাকছে ততবারই কি যেন দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে চাচ্ছে। এর নাম কি ভালবাসা? এতদিন এই ভালবাসা কোথায় ছিল? এই ভালবাসার জন্ম কি শরীরে? দু'টা শরীর পাশাপাশি এলেই কি এই ভালবাসা জন্মায়? তাহলে তো খুবই ভয়ংকর কথা।

জহির উদ্দিন বলল, মিলি, এক কাজ করি, ছোট ভাইজানকে বলি আমাদের সঙ্গে যেতে। তুমি একা একা যাবে — তোমার খারাপ লাগবে। ছোট ভাইজান কয়েকদিন থেকে আসুক। বলব?

'আচ্ছা বল।'

'উনি বোধহয় যেতে চাইবেন না।'

'বললেই ও যাবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে না বললেও ট্রেন যখন ছাড়বে ও লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বে।'

মিলি হাসছে। হাসতে হাসতেই মিলির মনে হল —

বাবার মৃত্যুর পর এমন আনন্দ নিয়ে সে আর হাসেনি। এই প্রথম হাসল। বাবা কি অনেক দূরের কোন ভুবন থেকে মিলির এই হাসি দেখছেন?

ফরহাদ গাড়িতে উঠে বসেছে। জহির গেছে ফরহাদের জন্যে টিকিটের খোঁজে। আতাহার এখনো সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে একেবারে গাছের মত লাগছে। গাছও মাঝে মধ্যে বাতাস পেলে ডালপালা নাড়ায় — এই মানুষটা তাও নাড়াচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে। মিলি হাত ইশারা করে ভাইকে ডাকল। আতাহার এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় আসছে।

মিলি বলল, ভাইয়া, এত দূরে দাড়িয়ে আছিস কেন?

আতাহার বলল, খুব কাছ থেকে কিছু দেখা যায় না রে মিলি। ভাল করে দেখতে হলে একটু দূরে যেতে হয়। দূরে দাঁড়িয়ে তোর আনন্দ দেখছি।

'আনন্দ?'

'আনন্দ তো বটেই। আনন্দে তুই খাবি খাচ্ছিস। কাতলা মাছের মত স্বামী নিয়ে কোন মেয়েকে এত আনন্দিত হতে আমি প্রথম দেখলাম।'

মিলি রাগ করল না। হেসে ফেলল। আতাহার বলল, বড়ভাই হিসেবে তোর বিয়েতে তোকে কিছু দিতে পারলাম না। একটা টাকা নেই পকেটে, কোত্থেকে দেব বল? যাই হোক, তোর জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। ট্রেন ঠিক যখন ছাড়বে তখন তোর হাতে দেব।

'জিনিসটা কি?'

'তা বলা যাবে না।'

'ভাইয়া, তুই চাকরি-বাকরি কিছু করবি না?'

'করব না কেন? অবশ্যই করব। আজ থেকেই চাকরি খোঁজা শুরু করব।'

'মা'কে রোজ দেখতে যাবি।'

'মা'কে দেখতে যাওয়া অর্থহীন। কে তাকে দেখতে আসছে কে আসছে না, মা তা জানে না। কোমা-তে থেকে কিছু বোঝা যায় না। আমার ধারণা, কোমা-তে থেকে মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের উচিত মা'কে সহজভাবে মরতে দেয়া।'

'এই ধরনের কথা মনেও আনবি না। আমি নিশ্চিত মা কোমা থেকে ফিরে আসবে। কিছুদিন আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি — তোর বিয়ে হচ্ছে। মা তোর বৌকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বউটা দেখতে কেমন?'

'দেখতে বেশি ভাল না। রোগা কালো, দাঁতগুলি উচু উচু . . .'

আতাহার বিরক্ত গলায় বলল, স্বপ্নে একটা মেয়েকে দেখবি — তাকেও কুৎসিত দেখতে হবে? মেয়েদের ঈর্ষাবোধ এত প্রবল যে তারা স্বপ্নেও কোন সুন্দর মেয়ে দেখে না।

'মিলি হাসি হাসি মুখে বলল, ভাইয়া স্বপ্ন কি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে?'

'অবশ্যই করে। আমি এখন পর্যন্ত স্বপ্নে কোন অসুন্দর মেয়ে দেখিনি। আমার স্বপ্নে সব রূপবতীরা ভিড় করে।'

'তুই কবি-মানুষ, তোর কথা আলাদা।'

'সেটাও একটা কথা।'

'ভাইয়া, একটা পান খাব। মিষ্টি পান। আশা করি একটা মিষ্টি পান কেনার মত টাকা তোর কাছে আছে।'

'তা আছে।'

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মিলি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, ভাইয়া, ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে। তুই আমার উপহার দিলি না? দে, কবিতাটা দে। তুই যে পকেটে করে কবিতা নিয়ে এসেছিস সেটা আমি জানি। আতাহার কাগজটা হাতে দিল। ট্রেনের গতি বাড়ছে — আতাহারের হাঁটার গতিও বাড়ছে। জহির উদ্দিন জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল, ভাইজান থামেন থামেন — একসিডেন্ট করবেন, একসিডেন্ট।

মিলি জলে ভেজা চোখ নিয়ে ভাইয়ের কবিতা পড়ছে। লেখাগুলি ঝাপসা লাগছে।

শোন মিলি!
দুঃখ তার বিষমাখা তীরে তোকে
বিঁধে বারংবার।
তবুও নিশ্চিত জানি, একদিন হবে তোর
সোনার সংসার॥
উঠোনে পড়বে এসে একফালি রোদ,
তার পাশে শিশু গুটি কয়
তাহাদের ধুলোমাখা হাতে — ধরা দেবে
পৃথিবীর সকল বিস্ময়॥

মিলি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। জহির উদ্দিন বিব্রত মুখে স্ত্রীর পাশে বসে আছে। মিলির কান্নায় ট্রেনের যাত্রিরা কিছু মনে করছে না। স্বামীর বাড়িতে যাবার সময় সব মেয়েই কাঁদে। কাঁদাটাই স্বাভাবিক।

মা'কে দেখে আতাহার ফিরে যাচ্ছিল। হাসপাতালের টানা বারান্দা, রাত বেশি বলেই বারান্দা নির্জন। হাসপাতালের নির্জন টানা বারান্দায় হাঁটতে আতাহারের গা সব সময়ই ছমছম করে। মনে হয়, এই বুঝি মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কুঁজো বিকট-দর্শন এক বৃদ্ধ যার চোখে কোন পাতা নেই বলে পলক পড়ে না। যার গলার স্বর তীব্র, তীক্ষ্ণ ও হিম-শীতল। কথা বলার সময় এই বৃদ্ধের মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ লালা পড়ে। হাসপাতালের নির্জন বারান্দায় হাঁটার সময়ই শুধু আতাহারের মনে হয় মানুষের মাথার পেছন দিকে দু'টা চোখ থাকলে ভাল হত। পেছনে কেউ আসছে কিনা বোঝা যেত।

'কবি সাহেব, কেমন আছেন?'

আতাহার থমকে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরল। যদিও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পেছন থেকে 'কবি সাহেব' বলে যে তাকে ডাকছে সে আর যাই হোক মৃত্যু নয়।

এপ্রণ পরা হাসি হাসি মুখের তরুণী আতাহারকে পেছন ফিরতে দেখে বলল, এ রকম চমকে উঠলেন কেন? ভয় পেয়েছেন?

আতাহার বলল, পেছন থেকে কেউ ডাকলেই আমি চমকে উঠি। তার উপর আপনি 'কবি সাহেব' ডাকলেন।

'মা'কে দেখে ফিরছেন?'

'জ্বি।'

আতাহার এই ডাক্তার মেয়েটিকে চেনে। কয়েকবার দেখা হয়েছে। কখনোই মেয়েটিকে তেমন রূপবতী মনে হয়নি। আজ হচ্ছে। রূপ সম্ভবত সময় ও পরিবেশ-নির্ভর। হাসপাতালের নির্জন টানা বারান্দায় সাধারণ রকম সুন্দর মেয়েকেও হয়ত অসাধারণ মনে হয়।

'মা'কে কেমন দেখলেন?'

'আগে যেমন দেখেছি এখনো তাই। জ্ঞান নেই — ডাকলে সাড়া দেন না। আজ কি আপনার নাইট ডিউটি?'

'জ্বি।'

সারারাত জেগে থাকবেন?'

'তা তো থাকতেই হবে।'

'সারারাত জেগে থেকে কি করেন?'

'যখন কাজ থাকে কাজ করি। যখন কাজ থাকে না — গল্পের বই পড়ি। বাসা থেকে গল্পের বই নিয়ে আসি।'

'কবিতা পড়েন না?'

'না, কবিতা পড়ি না।'

'আজ কোন্ বইটা পড়বেন?'

'আজ একটা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে এসেছি — Death in the maidem. আপনি পড়েছেন?'

'জ্বি না।'

'এর ছবিও হয়েছে। রোমান পলনস্কি ছবি করেছেন। ভিসিআর-এ প্রিন্ট পাওয়া যায়। আমি অবশ্যি এখনো দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'জ্বি-না। আমাদের ভিসিআর নেই।'

ডাক্তার মহিলা চলে যাবার মত ভঙ্গি করেও আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আতাহার নিজেও অবাক হচ্ছে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতগুলি কথা ডাক্তার মেয়েটা কেন বলল। মনে হয় সে রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত। কিংবা কে জানে এই মেয়েটিরও হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় আছে। একা বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে ভয় পাচ্ছিল বলে আতাহারকে দেখে এতগুলি কথা বলছে।

আতাহার বলল, আপনার যখন ঘুম পায় তখন কি করেন?

'নাইট ডিউটি যখন থাকে তখন ঘুম পায় না। তারপরেও ঘুম পেলে চা-কফি খাই।'

'নিজেই বানিয়ে নেন, না বাইরে থেকে আনান?'

'নিজেই বানাই। ইলেকট্রিক কেটলি আছে — আপনার কি চা বা কফি খেতে ইচ্ছে করছে?'

'জ্বি-না। চা-কফি কোনটাই খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে করছে।'

ডাক্তার মেয়েটির চোখ তীক্ষ্ণ হতে গিয়ে হল না। রাগ করতে গিয়ে সে রাগ করল না। খানিকটা গম্ভীর গলায় বলল, আসুন। আমি তিন তলায় বসি। আপনার মা'র সঙ্গে আমার প্রায়ই কথা হত সেটা কি আপনি জানেন? আপনার মা কি আপনাকে কখনো বলেছেন?

'জ্বি-না।'

'আপনি যে একজন কবি সেটা আপনার মা'র কাছ থেকেই শোনা।'

'মা আমাকে বটু ডাকেন, সেটা কি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। তাও জানি।'

'আপনার নাম কি জানতে পারি?'

'আমার নাম হোসনা। এর মানে হচ্ছে সৌন্দর্য। নামকরণের সার্থকতা বিষয়ে কিছু লিখতে বললে আমার বাবা-মা বিপদে পড়বেন। আমি সুন্দর নই। আমার

আরেকটা নাম আছে বুড়ি। এই নামটা মোটামুটি সার্থক বলতে পারেন। আমাকে দেখে বুড়ি-বুড়ি লাগছে না?'

'জ্বি লাগছে।'

হোসনা ইলেকট্রিক কেটলিতে চা চাপিয়েছিল। আতাহারের কথায় চমকে গিয়ে তাকাল। আতাহার বলল, আপনাকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে বললাম — 'লাগছে'।

হোসনা চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে। ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি অতি দ্রুত ফুটে। চা তৈরি হচ্ছে — তার অপেক্ষায় যে আনন্দ তা পাওয়া যায় না।

আতাহার বলল, আমার মা'র অবস্থাটা কি বলবেন?

'উনি 'ডীপ কমায়' আছেন।'

'তার থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা কতটুকু?'

'সম্ভাবনা কম। মেডিকেল সায়েন্স এই ডীপ কমা বিষয়ে তেমন কিছু বলতে পারে না। কেউ কেউ ফিরে আসেন। কেউ কেউ ফিরে আসে না। আট বছর কমাতে থেকে রোগীর জ্ঞান ফিরেছে, সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছে, জীবন শুরু করেছে — এ রকম নজির আছে।'

'যে কমায় থাকে তার কি কোন কষ্ট হয়?'

'আমি জানি না।'

'যে ভদ্রলোক আট বছর কমায় থেকে নতুন জীবন পেয়েছেন তিনি এই বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'বললেও আমি পড়িনি।'

'যে রোগী কোমায় আছে তার পাশে বসে আমি যদি কথা বলি সে কি শুনবে?'

'আমি বলতে পারছি না।'

'আপনার এখানে সিগারেট খেতে পারি?'

'হ্যাঁ, খেতে পারেন।'

আতাহার সিগারেট ধরাল। হোসনা বলল, আপনি আপনার মায়ের পাশে বসে গুনগুন করে প্রচুর কথা বলেন। তাই না?

'জ্বি বলি। আপনি জানেন কিভাবে?'

'আমরা অনেকেই জানি। আপনি আপনার মা'কে কি বলেন?'

'কিছু বলি না। গল্প করি।'

'গল্প করেন?'

'জ্বি। আমি নানান কথা বলি, মা জবাব দেন।'

'হোসনা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কথা বুঝতে পারছি না — উনি জবাব দেন মানে কি?'

'মা'র জবাবগুলি আমি কল্পনা করে নেই।'

'ও, আচ্ছা।'

'এই টেকনিকটা আমি শিখেছি নীতুর কাছে।'

'নীতু কে?'

'নীতু আমার এক বন্ধুর বোন। ও করে কি জানেন? টিভি নাটক দেখার সময় সাউন্ড অফ করে দেয় — এবং পাত্র-পাত্রীদের ডায়ালগ কল্পনা করে নেয়। এতে নাকি গল্পটা অনেক ইন্টারেস্টিং করা যায়।'

'নীতু কি আপনার প্রেমিকা?'

'আরে না। সামনের মাসের ১১ তারিখ নীতুর বিয়ে হচ্ছে। আরো আগেই হত। হঠাৎ নীতুর শরীর খারাপ করায় ডেট পেছানো হয়েছে।'

'আজ আপনি আপনার মা'র সঙ্গে কি গল্প করলেন?'

'ঢাকায় কি ঘটছে না ঘটছে সব তাঁকে বললাম। দু'টা মজার রসিকতা করলাম। তারপর মা'কে জিজ্ঞেস করলাম — তাঁর কষ্ট হচ্ছে কি-না।'

'আপনার মা কি বললেন?'

'মা বললেন, হচ্ছে।'

'আপনি যখন আবার কোনদিন আপনার মা'র সঙ্গে কথা বলবেন তখন কি আমি পাশে থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, পারেন।'

'আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বি-না। আজ উঠি।'

আতাহার উঠে দাঁড়াল। হোসনা বলল, আসুন আমি একটা শর্টকাট পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। মেয়েটির ভদ্রতায় আতাহার অবাক হয়ে গেল। মনে মনে সে বলল, বাহ, চমৎকার তো!

আতাহার হেঁটে হেঁটে ফিরছে। বড় মামার কারখানায় ফেরার ব্যাপারে কখনোই সে তেমন আগ্রহবোধ করে না। যত দেরিতে ফেরা যায় ততই ভাল। টিফিন কেরিয়ারে তার জন্যে খাবার টেবিলে থাকে। প্রতিদিন একই খাবার। ঠাণ্ডা কড়কড়া একগাদা ভাত। ডাল। একটা তরকারি। ভাতের উপর বিশাল এক টুকরা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা কেন দেয়া হয় কে জানে। আতাহারের ঘরে আরো একজন থাকেন, অফিসের ম্যানেজার পরিমল বাবু। তিনি সারারাত কাশেন। 'রাত-কানা' মানুষ আছে, 'রাত-কাশি' লোকও যে আছে আতাহার জানত না। পরিমল বাবুকে দেখে জানল। দিনের বেলা ভদ্রলোক একবারও কাশেন না। তাঁর কাশি শুরু হয় সূর্য ডোবার পর পর। এক একবার আতাহারের মনে হয় — কাশতে কাশতে ভদ্রলোকের ফুসফুসের টুকরা-টাকরা বোধহয় বের হয়ে পড়বে। কাশির বেগ প্রচুর বেড়ে গেলে ভদ্রলোক বিছানায় উঠে চোখ বড় বড় করে বলেন — "আতাহার, কি দীর্ঘ জীবন ভগবান দিয়েছেন। জীবনটা ছোট হলে বাঁচতাম।"

সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের কথা। তারাশংকরের উপন্যাসের এক নায়ক বলত —

"জীবন এত ছোট কেনে?" কে জানে কোনটা সত্য।

দু'টোই বোধ হয় সত্য। আতাহার পাঞ্জাবি খুলে বিছানায় বসল। গরম লাগছে। সিলিং ফ্যানটা বন্ধ। আতাহার ফ্যান ছাড়তে গেল। পরিমল বাবু বললেন, প্লীজ, নো নো।

আতাহার বলল, না কেন?

'বাতাসে বুকে ঠাণ্ডা বসে যায়। ঠাণ্ডা একবার বসে গেলে আমি আর বাঁচবনা ব্রাদার।'

'বেঁচে থেকে করবেন কি? দীর্ঘ জীবন নিয়ে কি হবে? মরে যাওয়াটা ভাল না? দেই ফ্যান খুলে?'

'নো নো। প্লীজ নো।'

'জানালাও দেখি বন্ধ করে রেখেছেন। দমবন্ধ হয়ে আমি নিজে মারা যাবো।'

'আমার দিকে তাকিয়ে একটু কষ্ট করুন।'

পরিমল বাবু কাশতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখ ঠিকরে বের হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন — আতাহার এই দীর্ঘ জীবন আর সহ্য হচ্ছে না। জীবনটা ছোট হলে বাঁচতাম।

হোসেন সাহেব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। গলার কাছে কাজ করা শাদা পাঞ্জাবি। গায়ে হালকা সেন্ট দিয়েছেন। সকালে সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলেন। মূল উদ্দেশ্য চুল কাটা না, কানের দু'পাশে যেখানে চুল বেশি শাদা হয়ে গেছে সেখানে হালকা করে কলপ দেয়া। সেলুনের নাপিত কাজটা ভাল করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল — বয়স বেশ কয়েক বছর কমে গেছে।

তিনি অপেক্ষা করছেন আতাহারের জন্যে। আতাহারকে নিয়ে আজ তিনি নীতুর বিয়ের কয়েকটা চিঠি বিলি করবেন। সেই কয়েকটা চিঠির একটা হচ্ছে ফরিদার। মেয়ের মা হিসেবে দাওয়াতের একটা চিঠি ফরিদার প্রাপ্য। সেই চিঠি যদি তিনি নিয়ে যান তাতে ক্ষতি কিছু নেই বরং সেটাই স্বাভাবিক। মেয়ে তার নিজের বিয়ের চিঠি নিজে নিয়ে যাবে এটা লজ্জা ও অস্বস্তির ব্যাপার। সাজ্জাদের তো কিছুদিন ধরে কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তিনি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন না। কিংবা ডাকেও পাঠাতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই তাকে যেতে হচ্ছে।

চিঠি দিয়েই চলে আসবেন সেটাও ভাল হবে না। কিছুক্ষণ বসতে হবে। সাধারণ কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ছেলেটা কেমন — এইসব। কথা বলতে তাঁর অস্বস্তি লাগবে। যে মেয়েটি এক সময় তার স্ত্রী ছিল সে অন্যের স্ত্রী। তার সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও এক ধরনের গ্লানি আছে। থাকলেও কি আর করা। সহজ স্বাভাবিকভাবে গল্প করে চলে আসবেন। চা তো দেবেই। চা খাবেন। চা যখন দেবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি যে চায়ে এক চামচ চিনি খান এটা ফরিদার মনে আছে কি না। অবশ্যই মনে থাকবে। মেয়েরা এইসব খুঁটিনাটি জিনিস খুব মনে রাখে। ফরিদার স্বামী বাসায় থাকলে খারাপ হবে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হবে।

সৌজন্যমূলক কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলবেন তাও মোটামুটি ঠিক করে রেখেছেন — তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম নিয়ে কথা বলতে সবাই ভালবাসে। ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই তাঁর মতই বুড়ো। বিজ্ঞান নিয়েও আলোচনা করা যায়। স্টিফেন হকিংসের নতুন বইটা — কি যেন নাম 'Baby Universe' . . . বইটা কিনেছেন। এখনো পড়া হয়নি।

ফরিদার জন্যে একটা উপহার-টুপহার কিছু নেবেন কি-না এটা অনেক দিন

ধরেই ভেবেছেন। সাধারণ উপহার। যেমন ফুলের তোড়া . . . না, ফুলের তোড়া নেয়া ঠিক হবে না — বই নেয়া যেতে পারে। এক প্যাকেট চকলেট নেয়া যায়। এতে দোষের কিছু নেই।

আতাহারের আসার কথা ঠিক দশটায়। আতাহার দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই চলে এল। ভালই হল, মিনিট দশেক সময় পাওয়া গেল। এক কাপ কফি খেয়ে বিসমিল্লাহ করে রওনা দেয়া।

'কেমন আছ আতাহার?'

'জ্বি চাচা, ভাল।'

'তোমাকে খুব ফ্রেস লাগছে।'

'আপনি বলেছিলেন গোসল-টোসল করে ফ্রেস হয়ে আসবে। তাই এসেছি।'

'গুড, ভেরী গুড। নানান জায়গায় যাব তো —প্রেজেন্টেবল হয়ে যাওয়াই ভাল। এক কাপ কফি খেয়ে রওনা দি — কি বল?'

'জ্বি আচ্ছা।'

'নীতুর আবার জ্বর এসেছে — বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে মেয়েটা দু'দিন পরপর অসুখে পড়ছে। টেনশান থেকে হচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারে এক ধরনের টেনশান সব সময় কাজ করে। এমন একটা মেয়েকে তুমি বিয়ে করছ যার সঙ্গে তোমার দীর্ঘদিনের পরিচয় কিংবা ইয়ে কি যেন বলে প্রণয়। তার সঙ্গে বিয়ে হলেও তুমি টেনশানে ভুগবে।'

'জ্বি, ঠিকই বলেছেন।'

'নীতুর মা'র সঙ্গে আমার যখন বিয়ে ঠিক হল — সে সময়ের কথাই ধর — তার সঙ্গে আমার অবশ্যি পূর্ব পরিচয় ছিল না। এরেঞ্জড ম্যারেজ। যাই হোক, বিয়ের দিন-তারিখ ফাইন্যাল হবার পর— টেনশানে রাতে আমি এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমাকে লিকুইড ব্রোমাইড দিল। শুতে যাবার আগে দু'চামচ খেলে মরার মত ঘুম হবার কথা। আমি তিন চামুচ খেয়ে শুয়েছি, তারপরেও এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।

'বলেন কি?'

'তুমি বস। আমি কফির কথা বলে আসি। না-কি চা খাবে?'

'একটা কিছু খেলেই হয়।'

'আরেকটা কথা — নীতুর মা'র জন্যে কোন উপহার-টুপহার কি কিছু নিয়ে যাব? ধর বই বা ফুল এই জাতীয় কিছু?'

'নিতে পারেন।'

'ও চকলেট পছন্দ করত। এক প্যাকেট ভাল চকলেট নিলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়।'

'শুধু চকলেট নেব না ফুলও নেব?'

'দু'টাই নিন।'

'অন্য কিছু ভাববে না তো আবার?'

'ভাবাভাবির কি আছে। একটা আনন্দ সংবাদ দিতে যাচ্ছেন — ফুল নিয়ে যাচ্ছেন। এতে ভাবাভাবির কি আছে?'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এই লাইনে চিন্তা করিনি। ঠিকই তো, আনন্দ সংবাদ দিতে যাচ্ছি, ফুল নিয়ে তো যাবই। এই ফুল হচ্ছে — মিলির বিয়ে হচ্ছে সেই আনন্দের ফুল। ধর, কোন রকম কারণ ছাড়া যদি আমি যেতাম, সঙ্গে এক গাদা ফুল, তাহলে তার ভিন্ন অর্থ হত। তা তো যাচ্ছি না। কথাটা তো তুমি খুবই ভাল বলেছ আতাহার। বাংলা প্রবচনে আছে — বুদ্ধি নিতে হলে তিন মাথাওয়ালা বুড়োর কাছে যাও। এখন তো মনে হচ্ছে তরুণদের মাথা বুড়োদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। ভাল চকলেট কোথায় পাওয়া যায় জান আতাহার?'

'জ্বি না।'

'গুলশানের দিকে পাওয়া যাবে। ঐখানে কিছু ভাল ভাল দোকান আছে।'

'জ্বি, চলুন যাই।'

'কফি খেয়ে যাই। কফি খেতে আর কতক্ষণ লাগবে।'

ফরিদার গুলশানের বাড়িটা দোতলা। লাল এবং হলুদ বাগানবিলাসে ঝলমল করছে। মূল বাড়ি ঢাকা পড়েছে রঙের ভিড়ে। বাড়ির দারোয়ান তাদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসাল। ছিমছাম সুন্দর ড্রয়িংরুম। নিচু দু'সেট সোফা, দেয়ালে কয়েকটা পেইনটিং। এতেই ঘরটা এত সুন্দর লাগছে! ঘরের দুই কোণায় মার্বেলের টেবিলে দু'টা ক্রিস্টালের মূর্তি। মূর্তি দু'টা দেখার মত। এসব বাড়িতে সাধারণত খুব দামী পার্সিয়ান কার্পেট থাকে। এ বাড়িতে কার্পেটের বদলে শীতল পাটি। আতাহার বলল, ড্রয়িংরুমটা তো সুন্দর করে সাজানো। হোসেন সাহেব তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, ঘর–দুয়ার সাজানোর ব্যাপারে ফরিদার খুব ঝোঁক।

কাজের একটা মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এসেছে। হোসেন সাহেব ফরিদা এসেছে ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার দেখাদেখি আতাহারও উঠে দাঁড়াল। কাজের মেয়েটিকে দেখে হোসেন সাহেব খুব লজ্জা পেলেন। মেয়েটি বলল, কার কাছে আসছেন?

'ফরিদার কাছে। ও আছে না?'

'জ্বি আছেন। আপনারা কি জন্যে এসেছেন? আপনাদের নাম?'

'তুমি গিয়ে বল নীতুর বাবা এসেছেন — হোসেন সাহেব। এই কার্ডটা নিয়ে দাও। কার্ড হাতে দিলেই বুঝবে।'

কাজের মেয়েটা কার্ড হাতে নিয়ে চলে গেল। হোসেন সাহেব আনন্দ নিয়ে বসার ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে ঘরের পর্দাগুলি একটু যেন ময়লা। ঝকঝকে ইস্ত্রি করা পর্দা ছাড়া এ বাড়ি মানায় না। ফরিদাকে পর্দার কথাটা বলবেন কি–না বুঝতে পারছেন না। বললে মনে কষ্ট পেতে পারে। একটা আনন্দের দিনে মনে কষ্ট পাওয়া যায়, এমন কিছু বলা উচিত না।

কাজের মেয়েটি নেমে এল। আগের মতই গম্ভীর গলায় বলল, আম্মার শরীর ভাল না। শুয়ে আছে। নিচে আসতে পারবে না। বলেছে আপনাদের চা খেয়ে যেতে।

হোসেন সাহেব অবাক হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন মেয়েটার কথা তিনি বুঝতে পারছেন না। আতাহার বলল, আমরা চা খেয়ে এসেছি। চা খাব না। আপনি ফুল আর চকলেটগুলি উপরে নিয়ে যান।

বর্ষা শেষের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। ড্রাইভার গাড়ি চালাছে। হোসেন সাহেব এবং আতাহার পেছনের সীটে বসে আছে। আতাহার বলল, চাচা, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

'না।'

'বাকি কার্ডগুলি কি আজ বিলি করবেন?'

'না, আজ থাক।'

'চলুন কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'চিড়িয়াখানায় যাবেন চাচা? মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে খুব ভাল লাগে।'

'চল যাই।'

আতাহার গাড়ির ড্রাইভারকে মীরপুরের দিকে যেতে বলল। হোসেন সাহেব ডাকলেন, আতাহার!

'জ্বি চাচা।'

'ফরিদার ব্যবহারে তুমি মনে কষ্ট পাওনি তো?'

'জ্বি না।'

'কষ্ট পেও না — বোধহয় কোন কারণে মন-টন খারাপ ছিল এই জন্যে দেখা করেনি। মানুষের মন বড় বিচিত্র আতাহার। মন একমাত্র জিনিস যার উপর মস্তিষ্কের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'জ্বি চাচা।'

'আমরা ইচ্ছা করলে চোখের পাতা বন্ধ করি। হাত নাড়তে পারি, পা নাড়তে পারি কিন্তু ইচ্ছা করলেই হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করতে পারি না। কেন পারি না জান আতাহার?'

'জ্বি না, চাচা।'

'কারণ মন বাস করে হৃদপিণ্ডে। মনের উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নেই — এই কারণে।'

আতাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রতি মমতায় তার চোখে পানি এসে যাবার মত হচ্ছে।

মোসাদ্দেক সাহেব পেইনটিংটা শেষ করেছেন। তিনি ক্লান্ত, কিন্তু তাঁর চোখ ক্লান্ত না। তিনি প্রায় পলকহীন চোখে তাঁর শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিটা এত সুন্দর হবে তিনি ভাবেননি। সাজ্জাদ যেমন বলেছিল তিনি ছবিটা তেমন আঁকেননি। প্রহর শেষের রাঙা আলোয় নৃত্যের দৃশ্য নয় — তিনি এঁকেছেন ভরা পূর্ণিমায় নৃত্যের ছবি।

এতে একটা বড় লাভ হয়েছে — মেয়েটির শরীরে তিনি জোছনার কাপড় পরিয়ে দিতে পেরেছেন। মেয়েটি নগ্ন, তারপরেও তাকে নগ্ন মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে প্রকৃতির একটা অংশ। মোসাদ্দেক সাহেবের মনে হল, এই ছবিটি এক্সিবিশনে পাঠাতে পারলে অনেকেই অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম দেখতে পারত। তিনি ছবির শিরোনাম দিতেন —

"আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে"

ছবির মূল্য তালিকায় লিখে দিতেন — বিক্রয়ের জন্যে নয়। কিছু কিছু ছবির ভেতর আত্মা জেগে উঠে। আত্মা বিক্রি হয় না বলে সেই সব ছবির মূল্য তালিকায় লিখতে হয় — বিক্রয়ের জন্যে নয়।

আত্মা বিক্রয়ের জন্যে নয় — তাও কি ঠিক? আত্মাও বিক্রি হয়। কে যেন তার নিজের আত্মা শয়তানের কাছে বিক্রি করল। কি নাম তার —

ড: ফস্টাস?

নাকি মেসিস্টোফিলিস? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তিনি নিজেও কি তাঁর আত্মা বিক্রি করে দেননি? হ্যাঁ, বিক্রি করেছেন। খুব অল্প দামে বিক্রি করেছেন। মোসাদ্দেক সাহেব খাটের নিচ থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন। তিনি ক্ষুধার্ত। সকাল থেকে কিছু খাননি। এখন প্রায় তিনটার মত বাজে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় 'র' হুইস্কি দ্রুত কাজ করবে। অতি অল্প সময়ে তিনি ঘোর এবং আচ্ছন্নতার একটা জগতে পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ছবিটা প্রাণভরে দেখে নিতে হবে। কারণ সাজ্জাদ সন্ধ্যার দিকে এসে ছবিটা নিয়ে যাবে। ছবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মার একটা অংশও চলে যাবে। তাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

মোসাদ্দেক সাহেব এক চুমুকে অনেকখানি হুইস্কি খেয়ে ফেললেন। মাথার শিরা

দপদপ করছে। হাতের আঙ্গুলগুলি মনে হচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ধ্বক ধ্বক শব্দ হচ্ছে — কিসের শব্দ? হৃদপিণ্ডের শব্দ? নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হৃদপিণ্ডের শব্দ এত স্পষ্ট হয় — আগে লক্ষ্য করেননি তো! তিনি আরো খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢাললেন। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল — তাঁর কাছে মনে হল ক্যানভাসে আঁকা মেয়েটা নাচছে। হেলোসিনেশন তো বটেই। প্রচুর মদ্যপান করলে এ রকম হয় — একটা মানুষকে দু'টা দেখা যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। মন্দ না তো। মেয়েটা তো ভারি সুন্দর করে নাচছে। নূপুরের শব্দ হচ্ছে না কেন? নাচলে নূপুরের শব্দ তো হবার কথা। নূপুরের শব্দ না হবার কারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। মেয়েটির পায়ে তিনি নূপুর আঁকেননি। নূপুর এঁকে দেয়া যাক। কতক্ষণ আর লাগবে। তাঁর হাত অবশ্যি কাঁপছে। তবে এই কম্পন তুলি হাতে নেয়ামাত্র থেমে যাবে।

তিনি তুলি হাতে নিলেন। নৃত্যরতা মেয়েটি মনে হল তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। নূপুর ছাড়া নেচে সেও বোধহয় আরাম পাচ্ছে না। মোসাদ্দেক সাহেব নূপুর আঁকতে বসলেন।

সাজ্জাদের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন বাজছে। সাজ্জাদ হাত বাড়ালেই টেলিফোন ধরতে পারে। তার ধরতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোনের শব্দে তার বিরক্তিও লাগছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে টেলিফোনটা খুব করুণ সুরে বাজছে। কান্নার একটা সুর আসছে। যন্ত্রটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে — প্লীজ, আমাকে হাতে নাও। আমার প্রতি দয়া কর, তুমি আমাকে হাতে নাও।

সাজ্জাদ টেলিফোন হাতে নিয়ে সত্যি সত্যি কান্না শুনল — ওপাশ থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

সাজ্জাদ বলল, কে?

ওপাশ থেকে লীলাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি লীলা।

'কাঁদছ কেন?'

'আপনার উপহার পেয়েছি। লজ্জা, দুঃখ এবং অপমানে কাঁদছি।'

'ছবিটা তো খুব সুন্দর।'

'সাজ্জাদ ভাই — আপনি একজন ভয়ংকর অসুস্থ মানুষ। ভয়ংকর অসুস্থ।'

'সুস্থ-অসুস্থ পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। আমার কাছে অন্যদের অসুস্থ মনে হয়।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল। কান্না থামাও, কান্না থামিয়ে বল। কান্নার জন্যে আমি তোমার কোন কথাই শুনতে পারছি না।'

'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কখন থেকে আপনি জানেন?'

'মনে নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমার মনে থাকে না।'

'আমার তখন তের বছর বয়স। মাত্র তের বছর।'

'আনলাকি থার্টিন?'

'আনলাকি তো বটেই, নয়ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে কেন? সেদিন আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিল মনে আছে?'

'না'

'আমার মনে আছে। শুধু সেদিন না — এই পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি যে ক'টা কথা বলেছি আমার সব মনে আছে। আমার প্রতিটি বাক্য দাড়ি-কমাসহ মুখস্থ আছে। আপনার স্মৃতিশক্তি আমার চেয়ে হাজারগুণে ভাল। কিছু কিছু মানুষের স্মৃতিশক্তি অপ্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখার জন্যে অসম্ভব ভাল। আমি সেই রকম একটা মেয়ে।'

'কান্না বন্ধ করে কথা বল লীলাবতী। আমি বেশির ভাগ কথাই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সব কথা না বুঝলেও হবে। আমার কথাগুলি বলা দরকার। আমি বলব তারপর টেলিফোন রেখে দেব।'

'আচ্ছা বেশ।'

'তের বছর বয়স থেকে আমার একটাই স্বপ্ন — আপনাকে পাশে পাওয়া। কত হাস্যকর ব্যাপার তার জন্যে করেছি শুনবেন? কার কাছে যেন শুনলাম আজমীর শরীফে গিয়ে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আমি মা'কে নিয়ে আজমীর শরীফ গেলাম। আপনি কি হাসছেন না?'

'না, হাসছি না। সিগারেট ধরিয়েছি। তারপর বল . . . '

'থাক, আর বলব না। শুনুন সাজ্জাদ ভাই, আপনি আমাকে কঠিন অপমান করেছেন। সেই অধিকার আপনার ছিল না। আপনি জানেন না — আমার জন্মদিনে এসে আমার খাটে ঠিক যে জায়গাটায় বসেছিলেন বাকি রাতটা আমি সেখানে বসেছিলাম — কারণ সেখানে আপনার গায়ের গন্ধ লেগে ছিল। আপনি কি হাসছেন সাজ্জাদ ভাই?'

'না। সিগারেট নিভে গিয়েছিল আবার ধরিয়েছি।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল।'

'আমি নাচ শিখেছিলাম শুধু আপনার জন্যে?'

'জানতাম না তো?'

'এগারো বছর বয়সে আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা তখন আপনি আমাকে বললেন — তুমি যে ড্রেসটা পরে আছ সেটা কি নাচের ড্রেস? তুমি কি এই অনুষ্ঠানে নাচবে? আমি বললাম, না। আপনি বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সুন্দর নাচতে পার।'

'ও, আচ্ছা।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল।'

'আপনি আর কোনদিন আমাদের বাসায় আসবেন না।'

'সেটা তো আগে একবার বলেছ।'

'আবার বললাম। আপনার দেয়ালে যে টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রেখে এসেছি

সেটা মুছে ফেলবেন।'

'আচ্ছা। তুমি কি পেইনটিংটা নষ্ট করে দিয়েছ?'

'না। ছবিটা আমি সারাজীবন আমার শোবার ঘরে টানিয়ে রাখব। আমি ঠিক করেছি জীবনে আর কোনদিনই নাচব না। এক সময় নাচতাম সেই স্মৃতিটি ছবিতে থাকুক।'

'লীলাবতী, পেইনটিংটা কি সুন্দর হয়েছে?'

লীলাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলল, হ্যাঁ।

'লীলাবতী, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'না।'

'না বলছ কেন? আমার মনের কথা তোমার জানার কথা না।'

'আপনি নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসেন না। এবং অন্য কারো ভালবাসাও বুঝতে পারেন না। আপনাকে আল্লাহ্ অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু ভালবাসার এবং ভালবাসা বোঝার ক্ষমতা দেন না।'

'হতে পারে।'

'টেলিফোন রেখে দিচ্ছি সাজ্জাদ ভাই।'

'আচ্ছা রেখে দাও। হ্যালো শোন, টেলিফোন রেখে দেবার আগে কি দু লাইন কবিতা শুনবে?'

'না।'

'মাত্র দু'টা লাইন। বেশী সময় লাগবে না।'

'আচ্ছা বলুন।'

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বলল,

তুমি থাক জলে আর আমি থাকি স্থলে
আমাদের দেখা হবে মরণের কালে।

আতাহার তার মা'র পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকল, 'মা' !

গভীর কমা থেকে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। আতাহার নিজেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল — কিরে বটু?

'কেমন আছ মা?'

'গভীর নিদ্রায় আছি। ভালই আছি। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস।'

'বসার জায়গা দেখছি না। নল-টল লাগিয়ে তোমাকে যা করে রেখেছে — বসতে গিয়ে কোনটা খুলে পড়বে — কি বিপদ হবে কে জানে।'

'বিপদ আর কি হবে। দাঁড়িয়ে থাকিস না, বোস।'

আতাহার সাবধানে মা'র পাশে বসল। ঘরে একজন নার্স ছিলেন, তিনি আতাহারের দিকে এক পলক তাকিয়ে বাইরে চলে গেলেন। এই ঘরে আলো বেশ কড়া। একটা আলো একেবারে চোখে এসে লাগছে। যে ঘরে রোগীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন সেই ঘরের আলো অনেক নরম হওয়া উচিত। জিরো পাওয়ারের নীল বাতি জ্বলবে। খুব মৃদু সংগীত বাজবে। ঘুম পাড়ানো গান —

খোকা ঘুমুল
পাড়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে।

ঘরটা অন্যান্য ঘরের তুলনায় ঠাণ্ডা। এসির কারণেই ঠাণ্ডা। হিম-হিম ভাব। এটা ঠিক আছে। গভীর নিদ্রা এবং মৃত্যু দুইই শীতল। ঘর শীতল হবেই।

'তুই কতক্ষণ থাকবি রে বটু?'

'বেশিক্ষণ থাকব না মা। রাত দশটার ট্রেনে নেত্রকোনা যাচ্ছি। মজিদকে দেখতে যাচ্ছি।'

'কোন মজিদ?'

'পাগলা মজিদ — তোমাকে যে মাসি ডাকতো সেই মজিদ। মনে পড়েছে?'

'উহুঁ।'

'ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। মোটাগাটা, থপ থপ করে হাঁটে। তোমাকে মাসি ডাকায় তুমি বললে — বাবা, তুমি আমাকে মাসি ডাকছ কেন? খালা ডাক। তখন সে বলল, আপনার হিন্দু হিন্দু চেহারা এই জন্যে আপনাকে মাসি ডাকছি। এখন মনে পড়েছে মা?'

'হুঁ, মনে পড়েছে।'

'অনেক দিন তাকে দেখি না — দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তুই একা যাচ্ছিস?'

'আমি একা যাব কি করে? আমার সঙ্গে কি টাকাপয়সা আছে? নেত্রকোনা যেতে ট্রেন ভাড়া লাগবে না? সাজ্জাদ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তোর হাতে টাকাপয়সা নেই?'

'কিচ্ছু নেই। কে এখন আমাকে টাকা দেবে? একশ' টাকা পরিমল বাবুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম — সেটা কবেই শেষ। উনি প্রতি দিন তিন-চারবার করে টাকাটা ফেরত চাইছেন। দিতে পারছি না।'

'তোর তো খুব খারাপ অবস্থা।'

'ভয়াবহ অবস্থা। তোমার অবস্থার চেয়েও একশ' গুণ ভয়াবহ। তুমি তো ঘুমে ঘুমে সব পার করে দিচ্ছ, কিছু টের পাচ্ছ না। আমি তো আর ঘুমুচ্ছি না। জেগে আছি।'

'সমস্যার কথা শুনতে ভাল লাগছে না রে বটু। ভাল কোন কথা বল।'

'ভাল কথা হচ্ছে — মিলি খুব সুখে আছে। ফরহাদ যে মিলির সঙ্গে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। সে চিঠিতে জানিয়েছে — ঐখানে থেকেই সে পড়াশোনা করবে।'

'ভালই তো। বোনের সঙ্গে থাকবে।'

'হুঁ ভাল।'

'তোর কি হবে?'

'বুঝতে পারেছি না মা।'

'তোর কবিতা লেখার কি হচ্ছে?'

'অনেক দিন কিছু লিখতে পারছি না।'

'কেন?'

'জানি না মা।'

'তোর মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? দুপুরে কিছু খেয়েছিস?'

'খেয়েছি।'

'মিথ্যা কথা বলছিস কেন বটু?'

'ও আচ্ছা, খাওয়া হয়নি।'

'পেটে খিদে নিয়ে আমার পাশে বসে আছিস?'

'এখন আর বসে থাকব না, উঠে যাব।'

'এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবি কেন? তোর ট্রেন তো রাত দশটায়। এখন বাজে মাত্র আটটা। কমলাপুর যেতে কতক্ষণ আর লাগবে?'

'অনেকক্ষণ লাগবে। রাস্তায় খুব ট্রাফিক জ্যাম। তাছাড়া যাবার আগে এখানকার একজন মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করব। চা বা কফি খাওয়াবে।'

'বুঝেছি — বুড়ি। ও মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যায়। বড় ভাল মেয়ে।'

'হুঁ — একটু পাগলী ধরনের, তবে ভাল।'

'ওকে বিয়ে করবি?'

'কি আশ্চর্য, ওকে বিয়ে করব কেন?'

'তুই তো কিছুই করিস না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াস — মেয়েটাকে বিয়ে করলে অন্তত খাওয়া-পরার দুঃশ্চিন্তা থেকে বাঁচবি। তোর কি মেয়েটাকে পছন্দ হয় না?'

'পছন্দ হয়। যাদের পছন্দ হয় তাদের বিয়ে করতে নেই মা।'

'এটা আবার কেমন কথা?'

'বিয়ে করলেই রহস্য থাকে না।'

'তোর যে কি সব পাগলামী কথা!'

'মা, যাই?'

'চলে যাবি?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য, যাবার আগে তুই আমাকে একবার ছুঁয়েও দেখবি না?'

আতাহার মা'র কপালে হাত রাখল। কি অদ্ভুত অবস্থা!

ভালবাসা নিয়ে একজন স্পর্শ করছে। অন্যজন সেই স্পর্শ ফিরিয়ে দিতে পারছে না।

আতাহার ডাক্তার হোসনার ঘরের দিকে রওনা হল। তাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। হয়ত গিয়ে দেখা যাবে আজ তার নাইট ডিউটি নেই। ঘর তালাবন্ধ।

হোসনা টেবিল থেকে ড্রয়ার বের করে ড্রয়ারের জিনিসপত্র সারা টেবিলে ছড়িয়েছে। শিশি, বোতল, তুলা, কেঁচি, রাজ্যের জিনিস। আতাহারকে ঢুকতে দেখে বলল, কবি সাহেবের খবর কি?

আতাহার বলল, ভাল।

'মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'কথা হয়েছে?'

'জ্বি, কথাও হয়েছে। আপনি কি খুঁজছেন?'

'টাং-ডিপ্রেসার — যা দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা যায়। জিহ্বা চেপে ধরলেই গলার ভেতরটা দেখা যায়।'

'খুঁজে পাচ্ছেন না?'

'পাব তো বটেই। সব ক'টা ড্রয়ার খুঁজতে হবে এবং মারফির সূত্র অনুসারে সবচে' শেষের ড্রয়ারে পাওয়া যাবে।'

'আজ তাহলে আমার চা খাওয়া হচ্ছে না।'

'না। আপনি বরং একটা কাজ করুন — কোন রেস্টুরেন্ট থেকে আমার একাউন্টে এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

'আপনি টাকা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু চা খাব নাকি? চায়ের সঙ্গে অন্য কিছুও খেতে পারি — চপ, সিঙ্গাড়া... ?'

হোসনা হেসে ফেলল। আতাহার লক্ষ্য করল, দারুণ ব্যস্ত ডাক্তার মেয়েও অন্যসব মেয়েদের মত সুন্দর করে হাসতে পারে।

'কবি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনাকে আজ ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে কেন?'

'ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে, কারণ দুপুরে কিছু খাইনি।'

'সে কি? খাননি কেন?'

আতাহার হাসিমুখে বলল, মাঝে মাঝে উপোস দিতে ভাল লাগে। উপোস দিলে বোঝা যায় শরীর নামক একটা ব্যাপার আমাদের আছে। সেই শরীরের দাবী উপেক্ষা করা কঠিন।

'আপনি কি মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে দয়া করে মিনিট দশেকের জন্যে বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি টাং ডিপ্রেসারটা খুঁজে বের করে আসছি। আপনাকে আমার পরিচিত একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব।'

'এখানে অপেক্ষা করলে অসুবিধা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমি কারো সামনে কিছু খুঁজতে পারি না।'

আতাহার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। স্ট্রেচারে করে একজন রোগীকে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মনে হয় ওটি-তে নিচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে — মধ্যবয়স্ক এই রোগীর মুখভর্তি হাসি। যেন সে আনন্দময় কোন কাজে রওনা হয়েছে। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে কত অসংখ্য বিস্ময়কর মুহূর্তের সম্মুখীনই না হয়। সবাই যদি তাদের দেখা বিস্ময়কর মুহূর্তগুলো লিখে রাখত তাহলে চমৎকার হত — একজন অন্য একজনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে পারত।

হোসনা বের হয়ে এসেছে। সে লজ্জিত মুখে বলল, কবি সাহেব, আমি যেতে পারছি না। আমার একজন পেশেন্ট মারা যাচ্ছে। আমার পরিচিত হোটেলটায় আপনাকে নিয়ে আরেকদিন যাব।

'আচ্ছা।'

'আর এই একশ'টা টাকা রাখুন। খেতে যা লাগে খরচ করবেন, বাকিটা আমাকে ফেরত দেবেন। খাবার শেষে একটা সিগারেট এবং একটা পান খাবেন।'

'আচ্ছা।'

আতাহার সহজ ভঙ্গিতে টাকা হাতে নেমে যাচ্ছে। হোসনা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আতাহার একবার পেছন দিকে ফিরলে হোসনার হাসিমুখ দেখতে পারত।

আতাহারকে চকচকে একশ' টাকার একটা নোট দিতে পেরে তার খুব ভাল লাগছে। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে বিশেষ কোন এনজাইম হয়ত রক্তে চলে এসেছে। রক্ত সেই এনজাইম দ্রুত নিয়ে গিয়েছে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সিগনাল পেয়ে আনন্দিত হয়েছে।

আতাহার টাকাটা খরচ করল না। রাতের খাওয়াটা সে সাজ্জাদের বাসায় সারতে পারে। খাওয়ার পর সাজ্জাদকে নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে আসা। তাছাড়া এম্নিতে নীতুকে দেখার জন্যে হলেও তার যাওয়া দরকার। নীতুর জ্বর বেড়েছে। দেখতে যাওয়া উচিত। দু'দিন পর পর মেয়েটা অসুখে পড়ছে। বিয়ের আগে এত অসুখ-বিসুখ হলে বিয়ের দিন তাকে তো পুরোপুরি পেত্নীর মত লাগবে।

নীতু তার খাটে শুয়ে আছে। তার গায়ে হালকা খয়েরি রঙের একটা চাদর। তার ঘরের বাতি নেভানো। শুধু মাথার পাশের সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সাইড টেবিলের পাশে এক গাদা কলা, কয়েকটা বেদানা এবং পলিথিনের ব্যাগে এক কেজির মত কালো আঙ্গুর। কামাল এইসব ফল-মূল নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই নীতুকে দেখে গেছে। সে প্রায় এক ঘণ্টার মত ছিল। এই এক ঘণ্টা সে নীতুর হাত ধরে বসেছিল। এখন কামাল নেই। কামাল যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারে বসে আছেন হোসেন সাহেব। তিনিও নীতুর হাত ধরে বসে আছেন। নীতু ভাবছে — একেকজন মানুষ হাত ধরলে একেক রকম লাগে কেন? বাবা হাত ধরামাত্র তার সারা শরীরে প্রবল এক শান্ত ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। মা যদি কোন এক অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ উপস্থিত হতেন এবং তার হাত ধরতেন তাহলে নিশ্চয়ই অন্য রকম লাগত।

হোসেন সাহেব বললেন, শরীরটা এখন কেমন লাগছে রে মা?

নীতু বলল, ভাল।

'তোকে যে জিনিসে ধরেছে তার নাম ভাইরাস, অন্য কিছু না। ভাইরাস ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। মিউটেশনের ফলে ভাইরাস চেঞ্জ হচ্ছে — ক্রমেই বদলাচ্ছে। এন্টিবায়োটিক ভাইরাসের উপর কাজ করে না, এ হচ্ছে আরেক সমস্যা। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'ভাইরাস জাতীয় সংক্রমণে প্রধান অষুধ হচ্ছে রেস্ট। রিলাক্সেশন এবং প্রচুর ভিটামিন-সি। গ্লাসভর্তি লেবুর সরবত খাবি, কমলার রস খাবি — দেখবি ভাইরাস কাবু হয়ে পড়ছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং ভাইরাস বিষয়ে একটা চমৎকার কথা বলেছেন . . .'

নীতু বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, ভাইরাসের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।

হোসেন সাহেব বললেন, ভাইরাসের গল্প শুনতে না চাইলে কি গল্প শুনতে চাস?

'কোন গল্পই শুনতে চাই না। তুমি চুপচাপ আমার হাত ধরে বসে থাক।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে। বসে থাকলাম।'

হোসেন সাহেব এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তিনি উসখুস করতে লাগলেন। লিনাস পলিং-এর ভাইরাস ব্যাখ্যা তিনি কিছুক্ষণ আগে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে পড়ে এসেছেন। নীতুকে শোনাবার জন্যেই পড়া। মনে হচ্ছে পড়াটা জলে গেল।

নীতু বলল, বাবা, তোমাকে এখন খুব জরুরী একটা কথা বলি?

হোসেন সাহেব বললেন, বল।

'কথাটা শুনে তুমি আপসেট হয়ো না, ঘাবড়েও যেও না।'

হোসেন সাহেব শংকিত গলায় বললেন, কথাটা কি?

'আমি কামাল সাহেব নামের এই মানুষটাকে বিয়ে করব না।'

'কি বলছিস তুই?'

'আমি যা বলছি খুব ভেবেচিন্তে বলছি। আরো অনেক আগে বলা উচিত ছিল। আই এ্যাম সরি যে আগে বলিনি।'

'চিঠিপত্র সব দিয়ে দিয়েছি।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কামালকে কি বলব?'

'বলবে যে আমার মেয়ের ধারণা তুমি মহা লোভী একজন মানুষ। আমার মেয়ে লোভী মানুষ পছন্দ করে না।'

'আমার ধারণা অসুখ-বিসুখে তোর মাথাটা ইয়ে হয়ে গেছে।'

'আমার মাথা 'ইয়ে' হয়নি। মাথা ঠিক আছে। তুমি যাও তো বাবা, এখুনি গিয়ে টেলিফোন কর।'

'এখুনি টেলিফোন করতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখুনি করতে হবে।'

হোসেন সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, তুই বরং আরেকটু ভেবে-টেবে নে।

নীতু বিছানায় উঠে বসল। শান্ত গলায় বলল, আমার যা ভাবার আমি ভেবেছি — আর ভাবব না। তুমি যাও তো বাবা, টেলিফোন কর। হোসেন সাহেব বিরস মুখে উঠে দাঁড়ালেন। নীতু ড্রয়ার খুলে চিঠির কাগজ এবং কলম বের করল। তার গায়ে এখনো ভাল জ্বর। তাতে কিছু যায়-আসে না। জ্বর নিয়েও সে যা লেখার খুব গুছিয়ে লিখতে পারবে। হয়ত হাতের লেখা তত ভাল হবে না। ভাল না হলে না হবে। হাতের লেখা বড় কথা না, কি লেখা হচ্ছে সেটাই বড় . . .

আতাহার ভাই,

আপনি কেমন আছেন? চারদিন হল জ্বরে কষ্ট পাচ্ছি। এই চারদিনে একবারও মনে হল না — যাই মেয়েটাকে দেখে আসি। গতকাল বাসায় এসে ভাইয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ ফুসফাস করে চলে গেলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম আপনি আমাকে দেখতে আসবেন। কাজেই খুব তাড়াহুড়া করে শাড়ি পরলাম। আমি দেখতে খারাপ তো — শাড়ি পরলে মাঝে-মধ্যে একটু ভাল দেখায়, তাই শাড়ি পরা —

আপনি আসেননি। আমি পরে খোঁজ নিয়েছি, আমার জ্বর সম্পর্কে কিছু জানতেও চাননি।

দরজায় পায়ের শব্দ হল। নীতু চিঠি লেখা বন্ধ করে তাকাল। আতাহার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আতাহার বলল, কয়েকদিনের জ্বরে তুই দেখি একেবারে শুটকি হয়ে গেছিস। শুটকির দোকানে তোকে ঝুলিয়ে রাখলে ছুড়ি মাছের শুটকি হিসেবে বিক্রি হয়ে যাবি।

নীতুর চোখ ভিজে উঠার উপক্রম হল। সে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'করছিস কি?'

'চিঠি লিখছি।'

'প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র?'

'দু'দিন পর তো বিয়েই হচ্ছে — এর মধ্যে প্রেমপত্র লেখার দরকার কি?'

'আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন?'

'তোকে বিরক্ত করছি?'

'হ্যাঁ, বিরক্ত করছেন। দয়া করে নিচে যান। চা-টা খেয়ে বিদেয় হোন।'

'অসুখে কাতর হয়ে আছিস, রোগী দেখে যাই — জ্বর আছে এখনো?'

'আতাহার ভাই, আপনি যান তো।'

'আচ্ছা রে ভাই যাচ্ছি। খ্যাক খ্যাক করিস না। প্রেমপত্র — লিখে শেষ কর। মেজাজ আকাশে তুলে রাখলে সুন্দর সুন্দর শব্দ মনে আসবে না। শুধু মনে আসবে কঠিন কঠিন তৎসম শব্দ — উৎপ্রেক্ষা, শ্লাঘা, বজ্রনাদ, বৃকোদর — এই টাইপ শব্দ।'

'আতাহার ভাই, আপনি যান।'

আতাহার চলে গেল। পরের তিন মিনিট নীতু ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। চিঠিটা লেখার চেষ্টা করল। আসলেই সে এখন আর চিঠি নিয়ে এগুতে পারছে না। নীতু ঠিক করল, চিঠি না, যা বলার সরাসরি বলাই ভাল। আজ বলাই ভাল। আতাহার ভাইকে সে ছাদে ডেকে নিয়ে যাবে, তারপর এতদিনকার জমানো কথা সব বলবে। কাঁদতে কাঁদত বলবে। নীতু বাথরুমে ঢুকে চুল আচড়াল। অসুস্থ অবস্থায় মুখে পাউডার দিতে নেই — তারপরেও মুখে হালকা করে পাউডার দিল। ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে আছে। হালকা করে একটু লিপস্টিক কি দেয়া যায় না? এমন হালকা করে দেয়া যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে। টিপের পাতাটা শেষ হয়ে গেছে। রোজ ভাবে আনাবে — আনানো হয় না। আজ একটা কাগজের উপর বড় বড় করে লিখবে 'টিপ', তারপর সেই কাগজটা আয়নার উপর স্কচ টেপ দিয়ে লাগিয়ে দেবে, যাতে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আয়নার দিকে তাকালেই মনে পড়ে — টিপ কিনতে হবে।

নীতু নিচে নেমে এসে শুনল, আতাহার এবং সাজ্জাদ রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা যাবে বলে বের হয়ে গেছে।

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আবদুল মজিদের ছাত্রীমহলে ভাল সুনাম আছে। ইনি ভাল পড়ান। ক্লাস ফাঁকি দেন না। ছাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন না। ছাত্রীদের যখন পড়া জিজ্ঞেস করেন, তাদের চোখের দিকে তাকিয়েই করেন, কখনো তাদের বুকের উপর চোখ রেখে করেন না।

ছাত্রীরা আবদুল মজিদ সাহেবের কাব্যপ্রতিভার কিছু জানে না। দুর্দান্ত এই আধুনিক কবি, যাঁর একটি কবিতার নাম —

$$(\text{ইশ্বর})^{\frac{১}{৩}} \times (\text{মৃত্যু})^{\frac{২}{৩}} = ০$$

প্রকাশিত হবার পর যে মোটামুটি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে ছাত্রীরা অজ্ঞ।

ছাত্রীদের এই সম্মানিত শিক্ষক প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করতে যান। কারণ তিনি থাকেন ওয়াদুদ সাহেবের বাড়িতে। ওয়াদুদ সাহেব গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এই অঞ্চলের ধনবান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি। ওয়াদুদ সাহেবের নেক নজর লাভ করা ভাগ্যের কথা। আবদুল মজিদ তা লাভ করেছে। ওয়াদুদ সাহেব মজিদকে থাকার জন্যে নিজের বাড়ির একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। মজিদের জন্যে তার বাড়ির ভেতর থেকে খাবার পাঠানো হয়। বিনিময়ে মজিদকে ওয়াদুদ সাহেবের তৃতীয়া কন্যা জাহেদা খাতুনকে ঘণ্টাদুই করে পড়াতে হয়। জাহেদা খাতুন এই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট দেবে। সে পড়াশোনায় ভাল। এসএসসি–তে স্টার পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটেও ভাল করবে।

জাহেদা খাতুন দেখতেও সুন্দর। কাটা কাটা চোখ–মুখ। মাথা ভর্তি চুল। স্যারের কাছে পড়তে যখন আসে তখন বেশ সেজেগুজে আসে। যেমন — চোখে কাজল থাকে। মেয়েটি খুবই শান্ত, চোখ তুলে তাকায় না বললেই হয়। আবদুল মজিদ যখন বলে — বুঝতে পারছ? জাহেদা তখন এত দ্রুত মাথা নাড়ে যে, মজিদের মনে হয় মেয়েটার মাথা বোধহয় শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। তার একেকবার বলতে ইচ্ছে করে — জাহেদা, এ রকম করে মাথা ঝাঁকিও না। মাথা ঘাড় থেকে খুলে পড়ে যাবে। তুমি কন্ধকাটা হয়ে যাবে। মজিদ বলে না, কারণ তার ধারণা মেয়েটা রসিকতা বুঝবে না। এই জাতীয় কোন কথা বললে কেঁদে–টেদে একটা কাণ্ড করবে। মূর্তির মত একটা মেয়েকে পড়াতে ভাল

লাগার কথা না, কিন্তু মজিদের ভাল লাগে।

শুক্রবার ছুটির দিন। জাহেদা শুক্রবারে পড়তে আসে না। এইদিন বিকেলের পর থেকে মজিদের খুব অস্থির লাগে। নিজের উপর রাগ লাগতে থাকে। যদিও রাগ লাগার কোনই কারণ নেই। সাপ্তাহিক ছুটি তো থাকবেই। একদিন পড়তে না এলে কি হয়? শুক্রবার ছাড়াও মেয়েটা অন্যান্য দিন হঠাৎ হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই পড়তে আসে না। মজিদ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভেতর বাড়ি থেকে মোটাসোটা একটি কাজের মেয়ে এসে বলে, রাঙ্গা আফা আইজ পড়ত না।

মজিদ গম্ভীর মুখে বলে, আচ্ছা। বলার পরেও সে নিজের চেয়ারে বসে থাকে। তার উঠে যেতে ইচ্ছো করে না। পরীক্ষার আগে আগে এরকম কামাই দেবার মানে কি? একদিন সে জাহেদাকে বলল —

'শোন জাহেদা, কোন কারণ ছাড়া হুট করে পড়া বন্ধ করবে না। পরীক্ষা ঘাড়ের উপর চলে এসেছে। এই সময় পড়া বন্ধ করবে না। মনে থাকবে?'

জাহেদা তার স্বভাবমত প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়েছে।

'শুক্রবারে তুমি আস না এটাও ঠিক না। আমি তো আর অফিস খুলে বসিনি যে শুক্রবারে অফিস ছুটি। আমি যখন আছি তখন তোমার পড়তে আসার সমস্যা কি? এরপর থেকে শুক্রবারেও আসবে।'

জাহেদা আবার মাথা নেড়েছে। তার সেই বিখ্যাত মাথা নাড়া। মনে হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

জাহেদা শুক্রবারে পড়তে আসেনি। শুধু শুধুই মজিদ অপেক্ষা করেছে। শেষে মেজাজ এত খারাপ হয়েছে যে, রাতে যখন নসু নামে কাজের ছেলেটা ভাত নিয়ে এসেছে তখন বলেছে — ভাত নিয়ে যাও। ভাত খাব না।

নসু বলেছে, খাইবেন না ক্যান?

'শরীর ভাল না। মনে হয় জ্বর।'

'রুটিপিঠা খাইবেন?'

'কিছুই খাব না। তুমি এইসব নিয়ে যাও তো।'

নসু টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে গেল। মজিদের ক্ষীণ সন্দেহ হল, জ্বরের কথা শুনে হয়ত জাহেদা তাকে দেখতে আসবে। দেখতে আসাটাই স্বাভাবিক। সে তার শিক্ষক। যথেষ্ট যত্ন নিয়ে তাকে সে পড়াচ্ছে। সেই শিক্ষকের শরীর খারাপ, জ্বর। জ্বর বেশি বলেই রাতের খাবার খায়নি। এ রকম অবস্থায় সাধারণ ভদ্রতা হচ্ছে ছাত্রীর এসে খোঁজ নেয়া।

মজিদ গরমের মধ্যেই একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। জাহেদা যদি এসে দেখে সে হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরছে তাহলে সে কি ভাববে?

জাহেদা দেখতে এল না। শুধু তাই না, পরের দিন পড়তে এসে একবারও জিজ্ঞেস করল না — স্যার, আপনার শরীর এখন কেমন?

মেয়েটা যদি কথাবার্তা বলতো তাহলে অনেক মজা করা যেত। মজিদ কয়েক লাইন কবিতা মেয়েটার হাতে দিয়ে বলত —

'জাহেদা — কবিতাটা মন দিয়ে পড়ে আমাকে বল অর্থ কি?'

জাহেদা মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, আমি পারব না স্যার।

'না পড়েই বললে পারব না। এটা তো ঠিক না। আগে পড়, খুব মন দিয়ে পড়।'

"জানি না ওপাশে কে আছে।
হেসে হেসে কি কথা সে কয়?
দাঁড়ায় না পায় শুধু ভয়।"

'কবিতাটার তো স্যার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মন দিয়ে পড়ছ না। মন দিয়ে পড়লেই বুঝতে।'

'হাজারো মন দিয়ে পড়লেও কিচ্ছু বুঝব না। আপনি বুঝিয়ে দিন।'

'প্রতিটি বাক্যের প্রথম অক্ষরটা নিয়ে দেখ কি হয়? প্রথম বাক্যের প্রথম অক্ষর জা, দ্বিতীয়টার হে, তৃতীয়টার দা। কি হল?'

'আপনার মাথা হল।'

'স্যারের সঙ্গে এ আবার কি ধরনের কথা?'

'স্যারেরই বা কি ধরনের কাণ্ড! ছাত্রীকে নিয়ে কবিতা লেখা! তাও যদি ঠিকমত হত। দাঁড়ায় বানান হল চন্দ্রবিন্দু দিয়ে — তাহলে নামটা হয় "জাহেদাঁ"। মনে হচ্ছে ভূতের নাম।'

'তোমার নামটা এরকম যে সুন্দর কবিতা হয় না।'

'তাহলে আমাকে আপনার পড়ানো দরকার নেই। এমন কাউকে পড়ান যার নাম দিয়ে সুন্দর কবিতা হয়।'

জাহেদা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মজিদ হাত ধরে তাকে বসাতে গেল। শক্ত করে হাত ধরতে গিয়ে কাঁচের চুড়ি একটা ভেঙে গেল। গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। মজিদ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ইশ! হাত কেটেছে!

জাহেদা বলল, হাত কাটুক কিন্তু আমার চুড়িটা যে ভেঙেছে তার কি হবে? এত শখ করে কাঁচের সবুজ চুড়ি কিনেছি। আপনি কি জানেন — সবুজ চুড়ি পাওয়া যায় না? আপনি কি কিনে দিবেন সবুজ চুড়ি?

এইসব হাস্যকর পরিকল্পনা মজিদ কেন করে সে জানে না। জাহেদা হাতে কাঁচের চুড়ি পরে না। তার হাত ধরার কল্পনাটা তো ভয়াবহ। একবার জাহেদার হাত থেকে কলম নেবার সময় হাতে হাত লেগে গিয়েছিল। এতে জাহেদা যেভাবে চমকে উঠে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তা দেখে মজিদর প্রায় দু'দিন মন খারাপ ছিল। এরপর থেকে কলমের দরকার হলে সে বলে, জাহেদা, কলমটা দাও তো। জাহেদা কলম দেয়। তবে হাতে দেয় না, তার সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখে। তখন মজিদের নিজেকে খুব তুচ্ছ, খুব

ক্ষুদ্র মনে হয় — ইচ্ছে করে ওয়াদুদ সাহেবকে বলে, আপনার নৈঃশব্দবতী কন্যাকে আমি পড়াব না। তার জন্যে অন্য মাস্টার রাখুন। সবচে' ভাল হয় যদি মাস্টারের বয়স ৮০-র উপরে হয় এবং মাস্টার সাহেবের দু'টা হাত হয় কাঠের।

এই জাতীয় কথা কখনো বলা হয় না। মজিদ সন্ধ্যার পর থেকে তীব্র আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে — কখন আসবে জাহেদা। এক পলক তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসবে চেয়ারে, পরবর্তী দেড় ঘণ্টা সেই মাথা সে আর উঁচু করবে না।

মজিদ তার ছাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। জাহেদা আসতে দেরি করছে। মজিদের বুক ধড়ফড় করতে লাগল — আজ আবার কোন কারণে সে আসা বাদ দেবে না তো? কাজের মেয়েটা এসে বলবে না তো — রাঙ্গা আফা আইজ পড়ব না।

না, তা হবে না। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মজিদ পায়ের শব্দে কাউকে চিনতে পারে না — শুধু একজনকে পারে। এটাও কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার না? বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষ হেঁটে গেলে সে বলতে পারবেনা কে হেঁটে যাচ্ছে — শুধু জাহেদা হেঁটে গেলে বলতে পারবে। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা কোনদিন মেয়েটি জানবে না — এই ট্রাজেডির কোন তুলনা হয়?

জাহেদা চেয়ারে এসে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নসু এসে বলল, ঢাকা থাইক্যা আফনের দুই বন্ধু আসছে — নাম বলছে সাজ্জাদ আর আতাহার।

দু'জনই মজিদের অতি প্রিয়জন। অনেক দিন সে তাদের দেখে না, আনন্দে মজিদের লাফিয়ে উঠা উচিত। কিন্তু মজিদের মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। তার ইচ্ছা করল সে চিৎকার করে বলে — এদের চলে যেতে বল। এদের আমি চিনি না।

মজিদ জাহেদার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আমি পড়াব না। কাল বেশি করে পড়াব। কেমন?

নৈঃশব্দবতী কথা বলল না, শুধু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সাজ্জাদ বলল, কিরে মজিদ, তোকে এ রকম লাগছে কেন?

'কি রকম লাগছে?'

'তোর কি যেন হয়েছে — তোর মধ্যে ঘর-জামাই ঘর-জামাই ভাব চলে এসেছে।'

মজিদ হাসল। তবে ঠিকমত হাসতেও পারল না। হাসিটা কেমন যেন ঠোঁটের কোণায় ঝুলে রইল।

সাজ্জাদ বলল, বোকার হাসি কবে থেকে শিখলি? ও মাই গড! কি অদ্ভুত করে হাসছিস! হয়েছে কি?

'কি আবার হবে?'

'ঝেড়ে কাশ তো। ঝেড়ে কাশ।'

'কফ থাকলে তবে না ঝেড়ে কাশব — কফ নেই।'

সাজ্জাদ আতাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, আতাহার, বল তো ঠিক করে ওকে কেমন লাগছে?

'ওকে গৃহস্থের মত লাগছে।'

মজিদ আবারো হাসল। সে এখনো ধাতস্থ হতে পারেনি। তবে বন্ধুদের দেখে এখন আনন্দ হচ্ছে। রক্তে পুরানো স্মৃতি জেগে উঠেছে। একে বোধ হয় বলে রক্ত উজানে যাওয়া।

মজিদ বলল, তোদের পরিকল্পনা কি?

সাজ্জাদ বলল, তোকে নিয়ে ফুল-মুন দেখব।

'আজ ফুল-মুন না-কি?

আতাহার বলল, আজ ফুল-মুন নাকি তাও জানিস না? তোর হয়েছে কি? তুই কি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিস ?

'উহুঁ।'

'অবশ্যই ছেড়ে দিয়েছিস। তোকে দেখেই মনে হচ্ছে তুই বর্তমানে মফস্বলি অধ্যাপক। আজ রাতের জন্যে অধ্যাপকী খোলসটা ঝেড়ে ফেলে দে।'

মজিদ শংকিত গলায় বলল, ঝেড়ে ফেলে কি করব?

সাজ্জাদ বলল, আমরা ত্রিমূর্তি বোহেমিয়ান জীবনে ফিরে যাব। তোদের এখানে ব্রথেল আছে না?

মজিদ আঁতকে উঠে বলল, কি সর্বনাশের কথা!

'আছে কিনা সেটা বল।'

'আছে তো নিশ্চয়ই। তবে কোথায় তা জানি না।'

সাজ্জাদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ওদের কয়েকটাকে ধরে এনে চল নদীর পাড়ে চলে যাই। চাঁদের আলোয় ধেই ধেই করে নাচানাচি করব।

'পাগলের মত কথা বলিস না তো।'

'পাগলের মত কথা মানে? আজ রাতটা হবে নাইট অব দ্যা পোয়েটস।'

'এখানে এসব সম্ভব না।'

'অবশ্যই সম্ভব। ইমপসিবল ইজ দ্যা ওয়ার্ড ফাউন্ড ওনলি ইন দ্যা ডিকশনারি অব ফুলস। তুই তো বোকা না। তোদের এখানে নদী আছে?'

'হুঁ।'

'ছোট না বড়?'

'ছোট তবে এখন ভাল পানি আছে।'

'একসেলেন্ট। বজরা ভাড়া পাওয়া যাবে?'

'জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে ব্রথেলের মেয়েদের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর কর।'

'মেয়ে ছাড়া নাইট অব দ্যা পোয়েটস হবে কি ভাবে? এ বাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে

ভাব-টাব হয়নি? ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে চল।'

মজিদ হড়বড় করে বলল, ওয়াদুদ সাহেবের কোন মেয়ে নেই। উনার দুই ছেলে। দোস্ত আরেকটা কথা, এই বাড়িতে কোন মদ খাওয়া-খাওয়ি হবে না। এরা অসম্ভব রকম কনজারভেটিভ।

সাজ্জাদ বলল, আমাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেই রগ কেটে ফেলবে?

'প্রায় সে রকম।'

'জেনে-শুনে তুই এই জায়গায় পড়ে আছিস? ব্যাপারটা কি? তুই ঝেড়ে কাশ তো সোনামণি।'

সোনামণি ঝেড়ে কাশতে পারল না। সে চাচ্ছে দ্রুত বন্ধুদের নিয়ে বের হয়ে পড়তে। মাগরিবের নামাজের পর ওয়াদুদ সাহেবের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে। মজিদ চাচ্ছে না তার বন্ধুদের সঙ্গে ওয়াদুদ সাহেবের দেখা হোক। সাজ্জাদের মুড ভাল থাকলে অসম্ভব ভদ্র ব্যবহার করবে। ওয়াদুদ সাহেব তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মুড খারাপ থাকলে সে ওয়াদুদ সাহেবকেই হাসিমুখে বলবে, স্যার, কিছু মনে করবেন না — আপনাদের এখানকার ব্রথেলটা কোন দিকে?

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়' — এই প্রবচন সত্য প্রমাণ করার জন্যেই — ওয়াদুদ সাহেবের সঙ্গে সবার দেখা হয়ে গেল। মজিদ চাপা আতংক নিয়ে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল। সাজ্জাদের এসএসসি এবং অনার্সের রেজাল্টের কথা বলতে ভুলল না। ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনারা এই সন্ধ্যাবেলা যাচ্ছেন কোথায়? বিশ্রাম করেন। খাওয়া-দাওয়া করেন।

সাজ্জাদ বলল, স্যার, আমরা গ্রামের জোছনা দেখতে এসেছি। রাতে খাওয়া-দাওয়া করব না।

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, রাতে খাওয়া-দাওয়া করবেন না মানে? জোছনা খেয়ে পেট ভরে?'

'ঠিকমত খেতে পারলে জোছনা খেয়েও পেট ভরে। বেশিরভাগ মানুষ জোছনা খাওয়ার টেকনিক জানে না।'

ওয়াদুদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মজিদের দিকে তাকালেন। মজিদ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমরা চলে আসব। রাত একটু বেশি হবে কিন্তু চলে আসব।

'যাচ্ছ কোথায়?'

মজিদ বলল, নদীর ধারে হাঁটব।

ওয়াদুদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, নদীর পাড়ে মানুষ হাঁটে? নদীর পাড় হল পায়খানা করার জায়গা।

সাজ্জাদ বলতে যাচ্ছিল — আমরা পায়ে 'গু' মাখার জন্যেই ঐদিকে যাচ্ছি। অনেকদিন পায়ে 'গু' মাখা হয় না। মজিদের করুণ মুখ দেখে বলল, স্যার, আমরা খুব সাবধানে হাঁটব। আমার নাক কুকুরের নাকের মত। এক মাইল দূর থেকে গন্ধ পাই।

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনারা জোছনা দেখতে চান তো আমার একটা খামার

বাড়ির মত আছে, সেখানে চলে যান না। সুন্দর বাগান আছে, টিনের একটা ঘর আছে, পাশ দিয়ে নদী গেছে। ইচ্ছা করলে নদীর পাড় ধরে হাঁটতেও পারেন।

সাজ্জাদ বা আতাহার কিছু বলার আগেই — মজিদ হড়বড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।

'নসুকে বলে দেই, নসু তোমাদের নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।'

'বেশি দেরি করবেন না। চলে আসবেন। একসঙ্গে খানা খাব'

আবারো মজিদ হড়বড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।

সাজ্জাদ বলল, স্যার, আপনি খেয়ে নেবেন। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আমাদের খাওয়া ঢেকে রাখলেই হবে। আমরা কখন ফিরি ঠিক নেই। মজিদের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। পেট ভর্তি গল্প জমা হয়ে আছে।

'বেশি দেরি না করাই ভাল।'

'রাত গভীর না হলে জোছনা ফুটে না। জোছনা ফোটার জন্যে একটু দেরি স্যার হবেই।'

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনি আমাকে স্যার স্যার বলছেন কেন?

'আপনার আপত্তি থাকলে আর বলব না। চাচা ডাকব। চাচা, আমরা তাহলে যাই।'

ওয়াদুদ সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন।

গ্রামের চাঁদ শহরের চেয়ে কি আগে ওঠে? রাত বেশি হয়নি, এর মধ্যেই আকাশে বিশাল এক চাঁদ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সাজ্জাদ বলল, জোছনার অবস্থাটা দেখেছিস?

"সে কোন জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না
আসিবে না কখনো প্রভাতে"

আতাহার বলল, বল দেখি কার লাইন?

আতাহার বলল, জী দাশ বাবুর লাইন।

'এই কবিতার শেষ লাইন বলতে পারবি?'

'না।'

'মজিদ পারবে। কি রে মজিদ, তুই পারবি না?'

মজিদ বিরস গলায় বলল, শেষ লাইন হচ্ছে —

"অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে, আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।"

'একসেলেন্ট। কবিতাটার মজাটা কোথায় জানিস? আলো আসছে, ভোর হয়ে আসছে — এই দুঃখে কবি বিষণ্ন। এখানেই কবির সঙ্গে আমার মিল। আমিও অন্ধকারের কবি।'

মজিদ বলল, আমাদের এখন উঠা দরকার।

সাজ্জাদ বলল, এই কবিতাটা কেমন দেখ তো —

'আকাশে চাঁদের আলো — উঠোনে চাঁদের আলো — নীলাভ চাঁদের আলো
এমন চাঁদের আলো আজ
বাতাসে ঘুঘুর ডাক — অশথে ঘুঘুর ডাক — হৃদের ঘুঘুর যে ডাক
নরম ঘুঘুর ডাক আজ।'

এই কবিতায় আমি একটা ভুল করেছি — ইচ্ছা করে করেছি। ভুলের জন্যে মাত্রায় গণ্ডগোল হয় গেছে। বল দেখি আতাহার ভুলটা কি?

আতাহার বলল, আমরা জোছনা দেখতে এসেছি, না কবিতার পরীক্ষা দিতে এসেছি?

সাজ্জাদ বলল, মজিদ, তুই বল। তুই পারবি।

মজিদ বলল, অশ্বত্থে হবে না, শব্দটা অশথে। জীবনানন্দ ইচ্ছে করে ভুল বানান ব্যবহার করেছেন।

'একসেলেন্ট। তোর মত একজন কবি গ্রামে এসে গৃহপালিত কুকুর হয়ে গেলি — এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই। আমি এসেছি তোকে উদ্ধার করতে।'

'আমাকে উদ্ধার করতে হবে না।'

সাজ্জাদ ব্যাগ খুলে পেটমোটা একটা বোতল বের করল। মজিদ আঁতকে উঠে বলল, অসম্ভব, মদ খেয়ে ঐ বাড়িতে যেতেই পারব না।

সাজ্জাদ বলল, ঐ বাড়িতে যাবার দরকার কি? কোন দরকার নেই। আমরা সারারাত জোছনা দেখব। পায়ে গু মাখব। ভোরবেলা সুবোধ বালকের মত ঢাকা চলে যাব।

মজিদ বলল, পাগলের মত কথা বললেই হল? আমাকে গলা টিপে ধরলেও আমি এক ফোঁটা মদ খাব না।

'এটা মদ না।'

'মদ না তো কি?

'সিদ্ধির সরবত। পেস্তা বাদাম, ধুতরার পাতা দিয়ে অনেক ঝামেলা করে ঢাকা থেকে বানিয়ে এনেছি। নিধুবাবু নামের জনৈক এক্সপার্ট বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি কালীপূজা ছাড়া সিদ্ধির সরবত বানান না। আমার বিশেষ অনুরোধ এবং বিশেষ অর্থ ব্যয়ের কারণে বানিয়েছেন। এই সিদ্ধির সরবত খাইয়ে — আজ তোর সিদ্ধিলাভ ঘটাব।'

মজিদ বলল, অসম্ভব!

আতাহার বলল, ও খেতে চাচ্ছে না, ওকে জোর করে খাওয়ানোর দরকার কি?

সাজ্জাদ বলল, আচ্ছা থাক, আমি একাই খাব। আমি এই জোছনা পুরোপুরি অনুভব করতে চাই।

সাজ্জাদ বোতল থেকে ঢক ঢক করে অনেকখানি মুখে ঢালল। মুখ মুছে বলল, তোরা গান শুনবি?

কেউ হ্যাঁ বা না বলার আগেই সাজ্জাদ গান ধরল —

বাউলা কে বানাইল রে?
হাসন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে?

কিছু কিছু মানুষ বাউলা হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। কে তাদের বাউলা বানায়? সে কে? কে?

টলমলে জোছনায় এই গান বাউলা শ্রেণীর মানুষদের বড়ই কাবু করে। বিচিত্র উপায়ে এই গান তাদের রক্তে ঢুকে যায়। এক সময় রক্তের লোহিত রক্তকণিকারাও গানে অংশগ্রহণ করে। তখন মানসিক সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

মজিদ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখি বোতলটা। সে হড়হড় করে অনেকখানি মুখে ঢেলে দিল। তারপর বোতলটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকল। এই তিন যুবকের জন্যে চাঁদ অনেকখানি নিচে নেমে এল। সে তার জোছনাকে আরো তীব্র এবং একই সঙ্গে আরো কোমল করল।

মজিদ বলল, জোছনায় গোসল করলে কেমন হয়? গায়ের সব ময়লা জোছনায় ধুয়ে ফেলি। কি বলিস?

বাকি দু'জন জবাব দিল না। মজিদ তার শার্ট-পেন্ট খুলে ফেলে পুরোপুরি নগ্ন হল। জোছনা সারা গায়ে ডলে ডলে স্নান শুরু করল।

রাত বাড়তে থাকল। সিদ্ধির সরবত তিন যুবককে অন্য জগতে নিয়ে গেল। যে জগতের সঙ্গে পৃথিবীর কোন যোগ নেই।

ওয়াদুদ সাহেব নসুকে সঙ্গে নিয়ে রাত দু'টার দিকে তাদের খোঁজে এলেন। মফস্বলের মানুষ সব সময় হাতে টর্চ রাখে। তীব্র চাঁদের আলোতেও তারা টর্চ-হাতে চলাফেরা করে। ওয়াদুদ সাহেব টর্চের আলো ফেলে ডাকলেন, মজিদ! মজিদ!

মজিদ খিক খিক করে হাসল।

সেই হাসির শব্দে যে কেউ আতংকগ্রস্ত হবে। তিনিও হলেন। তিনি ভীত গলায় বললেন, মজিদ, কি হয়েছে?

মজিদ বলল, কিছু হয় নাই। আমার কিছু হয় নাই। কিছু হয় নাই।

বলেই সে ঝোপের আড়াল থেকে বের হল। হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল ওয়াদুদ সাহেবের দিকে।

চাঁদের আলোয় নগ্ন একজন মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে — এই ভয়ংকর দৃশ্য তিনি দেখলেন। নসু দেখল। নসু বিড় বিড় করে কি যেন বলল। ওয়াদুদ সাহেবও বললেন। মজিদ আবারো খিক খিক শব্দ করে হাসল। পশুর গোংগানির মত শব্দ করে হাসতে তার খুব ভাল লাগছে।

নেত্রকোনা গার্লস কলেজ থেকে মজিদকে ছাটাই করা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বরখাস্তের চিঠিতে লিখেছেন — Your service is no longer required. চিঠিতে কোন কারণ দর্শানো হয়নি। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মজিদকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বলেছেন — বেসরকারি কলেজের চাকরি আর কারখানার মজুরের চাকরি এক রকম। মালিকের মর্জির উপর চাকরি। বুঝলেন ভাইসাহেব, আমাকে যে রকম লিখতে বলেছেন আমি লিখেছি। আপনার মত একজন ভাল শিক্ষক চলে যাচ্ছে। আফসোসের ব্যাপার।

মজিদ বলল, না, ঠিক আছে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, রুটি-রুজির মালিক আল্লাহ পাক। আপনি এইটা শুধু মনে রাখবেন। মানুষ রুটি-রুজির ব্যাপারে কিছু করতে পারে না। যা করার করেন উপরওয়ালা।

'জ্বি।'

'এখন বলেন তো দেখি মজিদ ভাই ব্যাপারটা কি? ওয়াদুদ সাহেবের সঙ্গে আপনার গণ্ডগোলটা কি নিয়ে? আমাকে বলা আর গাছকে বলা এক কথা। কাকপক্ষী জানবে না। বলেন দেখি ব্যাপারটা কি?'

মজিদ বলল, ব্যাপার কিছু না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, আমাকে ইন কনফিডেন্সে বলতে পারেন। একটা কানাঘুসা শুনছি — সমস্যাটা না-কি ওয়াদুদ সাহেবের মেয়েকে নিয়ে। মেয়ের না-কি ঝামেলা হয়ে গেছে — রোজ সকালে বমি-টমি হচ্ছে?

'ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন! সমস্যাটা — সম্পূর্ণই আমার, আমি বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধির সরবত খেয়ে নানান পাগলামি করেছি। ওয়াদুদ সাহেব দেখেছেন।'

'সিদ্ধির সরবত?

'হ্যাঁ — স্ট্রং হেলোসিনেটিং ড্রাগ।'

'ও।'

'নেংটো হয়ে নাচানাচি করেছি — হাসাহাসি করেছি।'

'নেংটো হয়ে নাচানাচি?'

'জ্বি।'

'সোবাহানাল্লাহ, কি বলেন? আমরা আরো উল্টা কথা শুনেছি। আমরা শুনেছি ...।'

'আপনারা কি শুনেছেন তা আমি শুনতে চাচ্ছি না। বিদায় হচ্ছি। আপনারা ভাল

থাকবেন।'

'নেংটো হয়ে সত্যি নাচানাচি করেছেন নাকি রে ভাই?'

'হ্যাঁ সত্যি করেছি।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ তো বটেই।'

'তাহলে এখন ঢাকা চলে যাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'ঢাকা গিয়ে কি করবেন?'

'পথে পথে নেংটো নাচ নাচব, বেশ্যার দালাল হব, কবিতা লেখব . . .।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। মজিদ নামের অতি ভদ্র, অতি বিনীত মানুষটা আজ কি ধরনের কথা বলছে? এ রকম একটা মাথা-খারাপ মানুষ মেয়েদের কলেজে এতদিন মাস্টারি করেছে? ভাবাই যায় না। এই লোককে তো অনেক আগেই পাগলা গারদে লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত ছিল।

মজিদের জিনিসপত্র ওয়াদুদ সাহেবের বাড়িতে। সে ঢাকা থেকে আসার সময় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল। এখন অল্পে অল্পে অনেক কিছু হয়েছে। লেপ, তোষক, কম্বল, চাদর, বালিশ। এইসব নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। এখানে আসার সময় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল, একটা স্যুটকেস নিয়েই তার ফিরে যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসীরা বলেন — আসছি নেংটা, যামু নেংটা। পৃথিবীতে আমরা নগ্ন হয়ে আসি, পৃথিবী থেকে ফিরেও যাই নগ্ন হয়ে।

মজিদ স্যুটকেস গুছালো — কয়েকটা শার্ট-পেন্ট আর এক তোড়া কাগজ, যার সাদা শরীরে কবিতা লেখা হয়েছে। সবই প্রেমের কবিতা। জনৈকা নৈঃশব্দবতীকে নিয়ে লেখা। তার এই জীবনের সঞ্চয়। লেপ, তোষক, কাঁথা বালিশ পড়ে থাকুক। এইগুলি কোন সঞ্চয় নয়।

যাবার আগে নৈঃশব্দবতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। তাকে সহজ গলায় যদি বলা যেত —

"শোন নৈঃশব্দবতী, তুমি থেকো সুখে।
তুমি থেকো চন্দ্র-শাদা দুধের সায়রে॥"

কিছুই বলা যাবে না। যাবার আগে দেখা হবে না। মজিদের গলার কাছে দলা পাকাতে লাগল। দুঃখের এই অনুভূতি তার শৈশবে হত। আর কখনো হয়নি। আবারো অনেক অনেকদিন পরে হল। কি হাস্যকর ব্যাপার! বায়বীয় দুঃখ জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। গলার কাছে এসে আটকে থাকে।

গোছগাছে সাহায্য করার জন্যে নসু এসেছে। দড়িদাড়া নিয়ে সে প্রবল উৎসাহে তোষক বাঁধতে শুরু করেছে। মজিদ বলল, নসু, এইসব আমি নেব না।

নসু অবাক হয়ে বলল, নিবেন না?

'না।'

'এইগুলো কি করবেন?'

'তুমি নিয়ে যাও।'

'আমি নিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ — লেপ-তোষক, বিছানা-বালিশ সব নিয়ে যাও। আর শোন, তুমি জাহেদাকে বলবে সে যেন ভালমত পড়ে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বলবে কিন্তু মনে করে।'

'অবশ্যই বলব। এখন বইল্যা আসি?'

'না, এখন বলতে হবে না। আমি চলে যাবার পরে বলবে।'

'জ্বে আইচ্ছা।'

'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াবে নসু?'

'অবশ্যই খাওয়াব। পানি খাওয়ামু না এইটা কেমন কথা?'

নসু পানি আনতে গেল। মজিদ সিগারেট ধরাল। এই বাড়িতে তার শেষ সিগারেট। সিগারেটের ছাই ফেলে সে চলে যাবে। "উইড়া যায়রে বনের পক্ষী পইড়া থাকে মায়া।"

'উইড়া যাবে আবদুল মজিদ,
পইড়া থাকবে ছাই।'

'পানি নেন।'

মজিদ চমকে তাকাল। পানির গ্লাস নিয়ে নসু আসেনি, এসেছে জাহেদা। সে অন্যান্য দিনের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে নেই। সে তাকিয়ে আছে মজিদের চোখের দিকে। পানির গ্লাসও ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল না। গ্লাস হাতে নিয়েই সে দাঁড়িয়ে আছে। আজ পানির গ্লাস তার হাত থেকেই নিতে হবে।

'কেমন আছ জাহেদা?'

'ভাল।'

জাহেদার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। আশ্চর্য! মেয়েটার চোখ এত সুন্দর।

'পানি নিন। কতক্ষণ গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকব?'

মজিদ পানির গ্লাস নিল। তার তৃষ্ণা চলে গেছে। তারপরেও এক চুমুকে পানির গ্লাস শেষ করল। জাহেদা বলল, স্যার, বাবা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে তা কি সত্যি?

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এইসব আর করবেন না।'

'না, আর কোনদিন করব না।'

'আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করুন।'

মজিদ বিস্মিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। কি বলছে এই মেয়ে?

জাহেদার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। মেয়েরা তাদের অশ্রু অন্যদের দেখাতে চায় না, প্রিয়জনদের তো কখনোই না। কিন্তু জাহেদা তার চোখ নিচু করছে না। সে তাকিয়েই আছে।

'আপনি কোথাও যাবেন না। এই বাড়িতেই থাকবেন। আমি বাবাকে বলেছি।'

'বাবা তোমার কথা শুনবে?'

'হ্যাঁ শুনবে। কই, আপনি তো আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করছেন না।'

মজিদ হাত বাড়াতেই নৈঃশব্দবতী তাকে জড়িয়ে ধরল। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! দরজা খোলা, জানালা খোলা, লোকজন আসা-যাওয়া করছেন। নৈঃশব্দবতী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মজিদ তার খাটে বসে আছে। তার হাতে একগাদা কাগজ। তার সারা জীবনে লেখা প্রতিটি কবিতা এই কাগজের তাড়ায় লেখা আছে। মজিদ বসে বসে কাগজগুলি ছিঁড়ে কুচি কুচি করছে। একটি প্রিয় জিনিস পেতে হলে অন্য একটি প্রিয় জিনিস ছাড়তে হয়। সে আজ থেকে কবিতা ছাড়ল। কবিতাকে তার আর প্রয়োজন নেই।

সালমা বানু চোখ মেললেন। ঘর আলো হয়ে আছে। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তবু কিছুই যেন ঠিক স্পষ্ট না। নতুন চশমা পরলে চারপাশ যেমন এলোমেলো লাগে — তেমন লাগছে। সব কেমন যেন আঁকা বাঁকা। মাথার উপরের ছাদ মাঝখানে খানিকটা যেন নেমে এসেছে। তিনি কোথায়? হাসপাতালে? হাসপাতালে যদি হন তাহলে ঘরটা চিনতে পারছেন না কেন? তাঁর তৃষ্ণা বোধ হল। প্রবল তৃষ্ণা না — হালকা ধরনের তৃষ্ণা। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি কেউ তাঁর হাতে দিলে তিনি ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করতেন। ঢক ঢক করে না। ঢক ঢক করে পানি খাওয়ার মত তৃষ্ণা তাঁর হয়নি। আরামদায়ক তৃষ্ণা। যে তৃষ্ণা নিয়ে রাতে ঘুমুতে যাওয়া যায়। ঘুমের অসুবিধা হয় না।

তিনি সাবধানে মাথা কাত করলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল কে যেন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। পুরো ঘরটা ফাঁকা। তাঁর একটু ভয় ভয় লাগল। তিনি ডাকলেন, রুনু, ও রুনু। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে রুনু নামের কাউকে তিনি চেনেন না। হঠাৎ এই নামটা কেন তাঁর মাথায় এল তিনি জানেন না। তাঁর শীত শীত করছিল। কেউ যদি একটা পাতলা সুতির চাদর তাঁর কোমর পর্যন্ত টেনে দিত। এটা কোন কাল? শীত কাল? আশ্বিনের শেষ ভাগ? আশ্বিনের শেষ ভাগে গায়ে হালকা সুতির চাদর দিতে হয়।

একটা চালতা গাছের কথা তাঁর মনে পড়ল। তাঁদের মামার বাড়ির উঠোনে চালতা গাছটা ছিল। ঘন সারিবদ্ধ পাতার কি বিশাল গাছ। পাতাগুলি করাতের মত খাঁজকাটা। মে-জুন মাসে বড় বড় ফুল ফুটতো। শাদা ফুল। মোটা পুরুষ্ট পাপড়ি। কি অদ্ভুত সুগন্ধি ফুল! মেজো মামী একবার চালতার আঠা এনে তাঁর মাথায় মাখিয়ে দিলেন, এতে না-কি চুল উজ্জ্বল হবে। চুল উজ্জ্বল হয়েছিল কি-না তাঁর মনে নেই। কারণ তার দু'দিন পরই তাঁর মাথা কামিয়ে দেয়া হয় যাতে ঘন হয়ে চুল উঠে।

তিনি হাসপাতালের এই ঘরে চালতা ফুলের গন্ধ পেতে লাগলেন। মনে হচ্ছে কাছেই কোথাও চালতা গাছ আছে। চালতা গাছ ছেয়ে ফুল ফুটেছে। তিনি আবারো ডাকলেন — রুনু, ও রুনু। তাঁর মন বলছে — রুনু নামের একজন কেউ পাশেই ঘুর ঘুর করছে। সে একটা পাতলা সুতির চাদর তাঁর কোমর পর্যন্ত টেনে দেবে। কাঁচের ঝকঝকে পরিষ্কার গ্লাসে করে এক গ্লাস পানি এনে দেবে। তখন তিনি রুনুকে

বলবেন, ও রুনু, তুই আমাকে কয়েকটা চালতা ফুল এনে দিতে পারবি? রাতের বেলা গাছ থেকে ফুল পাড়া নিষেধ। তবু তাঁর খুব ইচ্ছা করছে বালিশের কাছে কয়েকটা ফুল রেখে দিতে।

কিশোরী বয়সে বালিশের কাছে ফুল রেখে ঘুমানোর অভ্যাস হয়েছিল। ফুলের গন্ধ নিয়ে ঘুমুতে গেলে সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায়। সুন্দর স্বপ্ন দেখার লোভে রাতের পর রাত তিনি বালিশের পাশে ফুল নিয়ে ঘুমিয়েছেন।

একবার অদ্ভুত সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেওছিলেন। কিশোরী বয়সের সেই স্বপ্নে একটা কিশোর ছিল। যার চোখ দু'টি মেয়েদের মত জলেভরা। স্বপ্নে তিনি ছেলেটির সঙ্গে নানান ধরনের দুষ্টুমি করেছিলেন। সে কোন প্রতিবাদ করে নি। সারাক্ষণ মাথা নিচু করেছিল। এক একবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে কেঁদে ফেলবে। তবু তিনি দুষ্টুমি বন্ধ করলেন না। দুষ্টুমি করতে তাঁর এত মজা লাগছিল। স্বপ্ন ভাঙ্গার পর তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তাঁর মনে হল — এই রকম সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এরকম একটা ছেলের সাথেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিশোরী বয়সের স্বপ্নের ব্যাপারটা তিনি অবশ্যি কোনদিনই তাঁর স্বামীকে বলেন নি। ছেলেমেয়েদেরও বলেন নি। আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে— অথচ আজ কেউ পাশে নেই। রুনু মেয়েটা বোধ হয় আছে। তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, ও রুনু। রুনু।

রুনু জবাব দিল। অস্পষ্টভাবে বলল, হুঁ।

'ও রুনু, ঘরের জানালা বন্ধ কেন? জানালা খুলে দিলে চালতা ফুলের গন্ধ আরো ভাল পাওয়া যেত।'

কথাগুলি তিনি বললেন খুব স্পষ্টভাবে। তারপরই তাঁর তৃষ্ণা হঠাৎ বেড়ে গেল, শ্বাসকষ্ট শুরু হল। সমস্ত শরীরে বিচিত্র এক ধরনের ছটফটানি শুরু হল। তিনি আবারো ডাকলেন, ও রুনু। রুনু . . .

একবারের জন্যেও তাঁর নিজের পুত্র-কন্যা, স্বামীর কথা মনে পড়ল না। পরিচিত পৃথিবীর কারোর কথাই মনে এল না। রুনু নামের একটি কাল্পনিক মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে, চালতা ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে তিনি যাত্রা করলেন — রহস্যময় এক জগতের দিকে। তিনি মারা গেলেন রাত তিনটায়।

আতাহার ভোরবেলা কখনো হাসপাতালে আসে না। সেদিন কি মনে করে যেন এল। মা'র ঘরে উঁকি দিল। বেডের উপর লম্বালম্বিভাবে হলুদ রঙের একটা চাদর বিছানো। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রবল শোক তাকে আচ্ছন্ন করল না। বরং হঠাৎ নিজেকে খানিকটা মুক্ত বলে মনে হল। মনে হল, এই এতদিন পর বিবলিক্যাল কর্ড কাটা পড়ল। শিশুর জন্মের পর নাড়ি কেটে মা'র কাছ থেকে

তাকে আলাদা করা হয়। তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় তুমি এখন আর তোমার মায়ের শরীরের কোন অংশ না। তুমি আলাদা একজন মানুষ। সত্যিকার অর্থে কিন্তু সেই নাড়ি কাটা পড়ে না। যতদিন মা বেঁচে থাকেন ততদিন অদৃশ্য নাড়ির বন্ধন থাকে। বন্ধন কাটে মা'র মৃত্যুতে।

দীর্ঘদিনের অভ্যেসের কারণে আতাহার মনে মনে মা'কে বলল, কি ব্যাপার মা,এরকম হুট করে চলে গেলে যে?

বলেই লজ্জা পেল। এমন গভীর বিষাদের সময় এ জাতীয় হালকা কথাবার্তা কি বলা চলে?

আতাহার ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ মা। তোমাকে ধন্যবাদ। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টির প্রথম শর্ত হচ্ছে পূর্ণ মুক্তি। পুরোপুরি মুক্ত একজন মানুষই সৃষ্টি করতে পারে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মূল রহস্যই এইখানে — তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

হলুদ চাদর সরিয়ে মা'র মুখ দেখার কোন ইচ্ছা আতাহারের হল না। সে চাচ্ছে তার মনে জীবিত মানুষের মুখের স্মৃতিটিই থাকুক। মৃত মানুষের শীতল ছবি না।

আতাহার হাসপাতালের বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। এটা অন্যায় একটা কর্ম। জায়গায় জায়গায় নোটিশ ঝুলছে "ধুমপান মুক্ত এলাকা।" আজকের দিনে সামান্য অন্যায় বোধ হয় করা যায়। তাকে ঠাণ্ডা মাথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হবে। সারাদিনের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। মিলিকে খবর দিতে হবে। মিলি একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল — কোথায় আছে সেই নাম্বার কে জানে। নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। মনিকাকে টেলিফোন করতে হবে। খবর শুনে এরা দু'জনই আকাশ ফাটিয়ে কাঁদবে। এদের কান্না শুনতে হবে।

মৃত্যু ব্যাপারটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকার কোন উপায় কি আছে? মৃত্যু শোকে কাতর মানুষদের মৃত্যুশোক ভুলানোর জন্যে কোন ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত — বিশেষ একটা টেলিফোন নাম্বার। যে নাম্বারে ডায়াল করলেই সমবেদনায় আর্দ্র একটি কণ্ঠ বলবে,

"আমি জানি তোমার মন ভয়ংকর খারাপ। ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরেও এসো আমরা খানিকক্ষণ গল্প করি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ বাইরের আকাশ কি ঘন নীল। কত না মধুর বাতাস। তোমার চারদিকে জীবন ঝলমল করছে— এর মাঝখানে মৃত্যু নিয়ে ভেবোনাতো।"

আতাহার করিডোর ধরে এগুচ্ছে। তার একটা টেলিফোন করা দরকার। তার মন বলছে পরিচিত কারো সঙ্গে খানিকক্ষণ সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে কথা বললেই তার মন ঠিক হয়ে যাবে। যে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে — আওয়ামী লীগ, বিএনপি রাজনীতি। খালেদা হাসিনার ঠাণ্ডা স্নায়ু যুদ্ধ। গ্রীন হাউস এফেক্টে পরিবেশ গত বিপর্যয়। বিষ্ণুদের কবিতায় ভুল ছন্দ . . .

হাসপাতাল এবং রেলওয়ে ইনকোয়ারির টেলিফোন কখনো ডায়াল টোন থাকে না। রিসিভার উঠালে হয় ভয়াবহ নীরবতা কাকে বলে তা বোঝা যায় কিংবা কট কট শব্দ হয়। মনে হয় কেউ যেন জাঁতি দিয়ে টেলিফোনের তার কাটছে।

আতাহার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল হাসপাতালের ইনকোয়ারির টেলিফোন ঠিক আছে। ডায়াল টোন আসছে। সে সাজ্জাদের নাম্বার ডায়াল করল। দু'বার রিং হতেই সাজ্জাদ বলল, আতাহার তোর খবর কিরে?

আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, বুঝলি কি করে আমি?

'মাঝে মাঝে আমার সিক্সথ সেন্স খুব কাজ করে। রিং বাজা মাত্রই মনে হল তুই। খবর কি রে?'

'তেমন কোন খবর নেই।'

'তুই বাসায় চলে আয়। এক্ষুণি চলে আয়।'

'এখন আসতে পারব না। একটা সমস্যা আছে।'

'মানুষ হয়ে জন্মেছিস সমস্যাতো থাকবেই। চলে আয়।'

'এখন আসতে পারব না সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকব।'

'রাতে আসবি?'

'হ্যাঁ, তা আসতে পারি। কোথায়?'

'এখন বলব না। আগে এরেঞ্জ করে নেই।'

'আসে-পাশে কি নীতু আছে নাকি?'

'না। কথা বলবি? ডেকে দেই?'

'দে।'

আতাহার টেলিফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ইস, কেউ যদি এক মগ গরম এস্প্রেসো কফি তার হাতে ধরিয়ে দিত। আর একটা ডানহিল সিগারেট। ফেনা ভর্তি কফির মগে চুমুক দিতে দিতে সে টেলিফোনে কথা বলতে পারত।

'আতাহার ভাই!'

'কে, নীতু?'

'হুঁ।'

'তুই আছিস কেমন?'

'ভাল।'

'জ্বর কমেছে?'

'হুঁ।'

'শুনলাম কামাল সাহেবের সঙ্গে বিয়েটা হচ্ছে না। এ রকম হুটহাট ডিসিশান নিস কেন? খুব খারাপ।'

'আপনার কি হয়েছে আতাহার ভাই?'

'কিছু হয় নিতো।'

"আমার ধারণা হয়েছে। আপনার গলার স্বর পাল্টে গেছে।'

'মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'না ঠাণ্ডা না– অন্য কিছু। আতাহার ভাই আপনার মা কেমন আছেন?'

আতাহার জবাব দিল না। তার ইচ্ছা করছে টেলিফোনটা রেখে দিতে।

'আতাহার ভাই?'

'হুঁ।'

'আপনার মা কেমন আছেন?'

'কেমন আছেন বলতে পারছিনারে। তাকে একটা হলুদ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। শাদা চাদরে ঢেকে রাখা নিয়ম — মনে হয় এদের শাদা চাদর শেষ হয়ে গেছে।'

'আতাহার ভাই, আপনি কি হাসপাতালে?'

'হুঁ।'

'আমি আসছি।'

'তুই কি আমার জন্যে একমগ এস্‌প্রেসো কফি বানিয়ে আনবি? আমার খুব কফি খেতে ইচ্ছা করছে।'

'অমি কফি নিয়ে আসব।'

'তুই কি একটু সেজেগুজে আসবি নীতু? আমার খুব সুন্দর একটা মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

বাদ আছর আতাহার তার মা'কে কবরে নামিয়ে দিল। রাত ন'টা পর্যন্ত একা একা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে হাঁটল। দশটার দিকে সাজ্জাদের সঙ্গে গেল চানখার পুলের এক বাড়িতে। মজার কিছু দেখতে।

মজার ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে। আতাহার তাকিয়ে আছে। তার পেটের সবকিছু দলা পাকিয়ে উঠেছে। সে অনেক কষ্টে ঘেন্না চেপে রাখছে। কতক্ষণ চেপে রাখতে পারবে বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে শরীরের সমস্ত ঘেন্না বমি হয়ে বের হয়ে আসবে। দুর্গন্ধ বমিতে সে সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। কারণ তার চোখের সামনে নোংরা কদর্য একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে।

সে এবং সাজ্জাদ বসে আছে একটা টিনের বাড়ির মেঝেতে। এই গরমেও বাড়ির সব ক'টা জানালা বন্ধ। তাদের সঙ্গে আরো তিনজন আছে, যারা ডাল–খোর। নেশার জগতে ফেন্সিডিলের আদরের নাম হল ডাল। যারা দৈনিক তিন–চার বোতল খায় তারাই ডাল–খোর। ডাল খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর আনন্দময় আবহাওয়া বিরাজ করছে। তিন ডাল–খোরের একজন এখন আরেকটি বিচিত্র নেশা করবে। আতাহার এবং সাজ্জাদ তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। সে জ্যান্ত টিকটিকি খাবে। ডালের নেশা দু'–তিন ঘণ্টার বেশি থাকে না। ডালের পর একটা জ্যান্ত

টিকটিকি খেতে পারলে নেশাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পৃথিবী নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ধরা দেয়।

টিকটিকে যে খাবে তার নাম কুদ্দুস। সে এক কৃষি ব্যাংকের নাইট গার্ড। আজ তার অফ ডিউটি। সে মুখ-বন্ধ টিনের কৌটায় টিকটিকি নিয়ে এসেছে। টিনের কৌটার মুখ ফুটো করা আছে যাতে টিকটিকি মরে না যায়।

সাজ্জাদ বলল, কৌটায় কয়টা টিকটিকি আছে?

কুদ্দুস হাসিমুখে বলল, তিন-চারটা আছে, গনতি নাই। বেশীও থাকতে পারে।

'আপনি খাবেন ক'টা?

'ভাইজান একটা খাব। বিষাক্ত জিনিস তো — বেশি খাইলে বাঁচনের উপায় নাই।'

'জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন?'

'জ্যান্ত খাওনের নিয়ম। খাওনের পর ডাইল দিয়ে কুলি করলেই সব হজম। তবে ভাইজান — টিকটিকির লেজের বিষয়ে সাবধান। টিকটিকির সব বিষ তার লেজে।'

'লেজ খাওয়া যায় না?'

'তাও খাওয়া যায়। অনেক ঝামেলা আছে। লেজটারে প্রথম পুইড়া ছাই বানাইতে হয়। সেই ছাই সিগারেটের শুকার সাথে মিশাইয়া টানতে হয়।'

'আপনি টেনেছেন?'

'জ্বে-না, অত ঝামেলা পুষায় না।'

আতাহার বলল, জ্যান্ত টিকটিকি খান, ঘেন্না লাগে না?

'ঘিন্নার কি আছে? মাছ মাংস মানুষে খায় না? অত ঘিন্না করলে দুনিয়াতে বাঁচন যায় না। তাছাড়া ভাইজান, ডাইল-খোরের অত ঘিন্না থাকে না। এইটাই ডাইলের মজা। ডাইল খাইলে কোন কিছুতে ঘিন্না লাগে না। সবেরে বড় আপন লাগে। দুনিয়াটা যে রঙ্গিলা এইটা ডাইল না খাইলে বুঝা যায় না।'

আতাহার ঘৃণা ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। সাজ্জাদের চোখে কোন ঘৃণা নেই, বিস্ময়ও নেই। তার চোখে শুধুই কৌতূহল। নির্ভেজাল কৌতূহল।

কুদ্দুস টিনের কৌটা থেকে একটা টিকটিকি বের করে আনল। বাঁ হাতের আঙুলে একটা টোকা দিতেই টিকটিকির লেজ খসে পড়ল। কুদ্দুস হাসিমুখে বলল, বড়ই আজিব পোকা। লেজ খুইল্যা পড়ে, আবার লেজ হয়।

ছাদের দিকে মুখ করে কুদ্দুস প্রকাণ্ড হা করে টিকটিকিটা মুখের ভেতর ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করল। কচ কচ শব্দ হচ্ছে।

আতাহার ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে দু'হাতে পেট চেপে রাস্তায় বসে পড়ল। মনে হচ্ছে বমি করতে করতে সে রাস্তাতেই নেতিয়ে পড়বে। রাস্তা ফাঁকা, দূরে ডাস্টবিনের কাছে একটা কুকুর ছিল। সে উঠে দাঁড়াল। কুকুরটা ভীত পায়ে আতাহারের দিকে আসছে। আতাহারের মনে হল কুকুরটার চোখ মমতা ও

সহানুভূতিতে আর্দ্র। আতাহার ডাকল, আয় আয়, তুই আমার কাছে আয়।

কালো রঙের কুকুর এগিয়ে আসছে। আতাহার আবারো ডাকল, আয় আয় —। কি আশ্চর্য! এই অদ্ভুত অবস্থাতেই তার মাথায় কবিতার লাইন আছে। কোন মানে হয়? একজন কবি সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেন — একগাদা বমি সামনে নিয়ে সে বসে আছে। এর ভেতর সৌন্দর্য কোথায়? সৌন্দর্যের জন্ম অন্ধকারে। আলোর জন্মদাত্রী মা অবশ্যই অন্ধকার।

একটা ঝকঝকে রঙিন কাচপোকা
হাঁটতে হাঁটতে এক ঝলক রোদের মধ্যে পড়ে গেলো।
ঝিকমিকিয়ে উঠল তার নকশাকাটা লাল নীল সবুজ শরীর।
বিরক্ত হয়ে বলল, রোদ কেন?
আমি চাই অন্ধকার। চির অন্ধকার।
আমার ষোলটা পায়ে একটা ভারি শরীর বয়ে নিয়ে যাচ্ছি —
অন্ধকারকে দেখব বলে।
আমি চাই অন্ধকার। চির অন্ধকার

একটা সময়ে এসে রোদ নিভে গেল।
বাদুড়ে ডানায় ভর করে নামল আঁধার।
কি গাঢ়, পিচ্ছিল থকথকে অন্ধকার!
কাচপোকার ষোলটা ক্লান্ত পা বার বার
সেই পিচ্ছিল আঠালো অন্ধকারে ডেবে যাচ্ছিল।
তার খুব কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে।
তবু সে হাঁটছে —
তাকে যেতে হবে আরো গভীর অন্ধকারে।
যে অন্ধকার — আলোর জন্মদাত্রী।

কণার মুখ হাসিহাসি।

তাকে দেখে মনে হতে পারে আনন্দময় কোন অভিজ্ঞতার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। তার গায়ে ইস্ত্রি করা সুতীর ছাপা শাড়ি। শাদা জমিনে নীল রঙের ফুলের ছাপ। কণাকে দেখে মনে হচ্ছে তার শরীরে নীল ফুল ফুটে আছে। সত্যি সত্যি ফুটে আছে। কণা মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুল বেঁধেছে। মাথার গন্ধটাকেই মনে হচ্ছে ফুলের গন্ধ।

নার্স ঘরে ঢুকে কণার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টা খানিক।

কণা 'ঠিক আছে' বলে আগের মত হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল। নার্স বলল, আপনার স্বামী আসেন নি?

'জ্বি না।'

'উনি এলে ভাল হত।'

কণা হাসল। সেই হাসি যা তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে ফেলে। কণা তার তেইশ বছরের জীবনে এই হাসি অনেকবার ব্যবহার করেছে। হয়ত আরো অসংখ্যবার ব্যবহার করতে হবে। তার এখন আর ভাল লাগে না। হাসিটা সে শুধুমাত্র একজনের জন্যেই ব্যবহার করতে চায়। হাসি হল শরীরেরই একটা অংশ। ঠোঁটের ফাকে ফুলের মত ফুটে ওঠে। শরীর যেমন সবার জন্যে নয় — হাসিও তেমনি সবার জন্য না।

কণা বসে আছে ধানমণ্ডি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে তার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলা হবে। নতুন একজন মানুষের দায়িত্ব নেয়ার সামর্থ তার স্বামীর নেই। অনেক আলাপ অলোচনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবার পর কণা হেসেছে খিলখিল করে। কণার স্বামী বিরক্ত মুখে বলেছে, হাস কেন?

কণা বলেছে, হাসতে ভাল লাগে এইজন্যে হাসি। ছোটবেলায় খুব কাঁদতাম এইজন্যে নাম হয়ে গিয়েছিল কাঁদুনি। কাঁদুনি থেকে কানি। কানি থেকে কণা। বুঝলেন সাহেব?

'এত কথা বল কেন?'

'আচ্ছা যাও, কথাও বলব না।'

কণা শান্ত মুখে কেরোসিনের চুলা ধরিয়েছে। কৌটায় সামান্য কিছু কফি আছে।

স্বামীকে কফি বানিয়ে দিয়ে সে অবাক করে দেবে। চা ভেবে চুমুক দিয়ে দেখবে কফি। সে আঁৎকে উঠবে। মজার একটা ব্যাপার হবে। কণা সারাজীবন চেয়েছে তাকে ঘিরে সারাক্ষণ মজার মজার সব ঘটনা ঘটুক। কিন্তু তার জীবনটা এ রকম যে তাকে ঘিরে মজার কোন ঘটনা কখনো ঘটে না। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে।

তাকে কাপড় খুলে আধবুড়ো একজন মানুষের সামনে নানান অঙ্গ ভঙ্গি করে বসে থাকতে হয়। আধবুড়ো মানুষটা তার ছবি আঁকে। তবে মানুষটা ভাল। ঋষির মত মানুষ। মানুষটার চোখে লোভ ঝিলমিল করে না। কখনোই সে কোন অজুহাতে হাত দিয়ে তার নগ্ন শরীর ছুঁয়ে দেয় না। মানুষ এ রকম হয় কিভাবে?

একটা স্বাভাবিক জীবন কণার কেন হল না? আল্লাহ কি জন্মের সময় তার কপালে লিখে দিয়েছেন — এই মেয়েটার কোন স্বাভাবিক জীবন হবে না? সে সরাক্ষণ ভয়ংকরের ভেতর থাকবে। তার গর্ভে আসবে সুন্দর সুন্দর শিশু। তাদের একের পর এক ফেলে দিতে হবে। কোনদিন তাদের সে কোলে নিতে পারবে না। তাদের ঠোঁটে চুমু দিতে পারবে না। রাতের বেলা কাঁধে শুইয়ে সুর করে বলতে পারবে না —

আমার কথাটি ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল।
'কেনরে নটে মুড়ালি?'
'গরুতে কেন খায়?'
'কেনরে গরু খাস?'
'রাখাল কেন চরায় না?'
'কেনরে রখাল চরাস না?'
'বৌ কেন ভাত দেয় না?'
'কেনলো বৌ ভাত দিস না?'
'কলাগাছ কেন পাতা ফেলে না?'
'কেনরে কলাগাছ পাতা ফেলিস না?'
'জল কেন হয় না?'
'কেনরে জল হ'স না?'
'ব্যাঙ কেন ডাকে না?'
'কেনরে ব্যাঙ ডাকিস না?'
'সাপ কেন খায়?'
'কেন রে সাপ খাস?'
'খাবার ধন খাবুনি, — গুড় গুড়ুতে যা'ব নি?'

কোনকিছু নিয়েই কণা বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। তার ভাল লাগে না, মাথা

ধরে যায়। কিন্তু পেটের শিশুগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ভাবতে ভাল লাগে। শুধু যে তার ভাবতে ভাল লাগে তা না — এদের নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তার কথা বলতেও ভাল লাগে। তার কথা বলার লোক কোথায়? কাজেই সে নিজেই আশে পাশে থেকে লোক খুঁজে নেয়। হয়ত সে রিকশা করে যাচ্ছে — সে ফস করে বলে বসল, রিকশাওয়ালা ভাই আপনের ছেলেমেয়ে কি? রিকশাওয়ালা চমকে পেছন ফিরে তাকায়। তার চোখে চাপা সন্দেহ ঝিকঝিক করে। কণার ধারণা তাকে হয়ত খারাপ মেয়ে ভাবে। খারাপ মেয়েরাই রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে দ্রুত ভাব জমাবার জন্যে ব্যক্তিগত গল্প শুরু করে। তখন কণা তার বিশেষ হাসিটা হাসে। এই হাসি বলে দেয় — সে খারাপ মেয়ে না। ভাল মেয়ে। এরকম ভাল মেয়ে সচরাচর পৃথিবীতে আসে না। তবে ভাল মেয়ে হলেও সে খুব দুঃখী মেয়ে। এ রকম দুঃখী মেয়েও সচরাচর পৃথিবীতে আসে না।

কণা উঠে দাঁড়াল। এক জায়গায় বসে থাকতে থাকতে তার পায়ে ঝি ঝি ধরে গেছে। একটু হাঁটাহাটি করলে বোধহয় ভাল লাগবে। কণা বারান্দায় চলে এল। বারান্দাটা ফাঁকা। টুলের উপর একজন খাকি পোষাক পরা পিয়ন বসে আছে। বেচারা বোধ হয় কয়েক রাত ঘুমায়নি। আয়েশ করে ঝিমাচ্ছে। তাকে কি কণা জিজ্ঞেস করবে — পিয়ন ভাই, আপনার ছেলেমেয়ে কি? কণা নিশ্চিত এই প্রশ্ন করা মাত্রই পিয়নের চোখ থেকে ঘুম কেটে যাবে। সে লাফ দিয়ে উঠবে।

আচ্ছা, কণা কি পারেনা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পেটের শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে? সে নিজে যদি বেঁচে থাকতে পারে তার শিশুটি থাকবে না কেন? আচ্ছা, সেতো সাজ্জাদ নামের দারুণ বড়লোক ঐ ছেলেটার কাছে চলে যেতে পারে। পারে না? তাকে গিয়ে বলতে পারে —

'সাজ্জাদ ভাই আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি কণা।'

উনি হাসি মুখে বলবেন, হ্যাঁ চিনতে পারছি। কেমন আছ কণা?

'ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আমিও ভাল আছি।'

'কণা, তোমাকে কেমন জানি রোগা রোগা লাগছে। তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ?'

'উহুঁ। আমি খুব ভাল আছি। আমি আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি।'

'বল কি কাজ?'

'আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান। এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এখনো কি চান?'

'হ্যাঁ, এখনো চাই।'

'আমি রাজি আছি সাজ্জাদ ভাই।'

'সত্যি রাজি আছ?'

'হ্যাঁ সত্যি — তিন সত্যি।'

'তিন সত্যিটা কি?'

'মাটির সত্যি, আকাশের সত্যি আর পাতালের সত্যি।'

'তাহলে তুমি চলে এসো।'

'একটা কিন্তু আছে যে সাজ্জাদ ভাই।'

'কিন্তুটা কি?'

'আমার পেটে একটা শিশু আছে। শিশুটাকে আমি বড় করতে চাই।'

'অবশ্যই বড় করবে।'

'আমার স্বামীকেও তো ছেড়ে চলে আসতে হবে।'

'তাতো হবেই। আমাদের বর্তমান সমাজ এক স্বামীর দু'টি স্ত্রী সহ্য করে নিলেও, এক স্ত্রীর দুই স্বামী সহ্য করবে না।'

'কিন্তু ওকে তো আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি।'

'তোমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে বলেই তুমি ভালবাস। আজ তুমি তোমার স্বামীকে প্রচণ্ড ভালবাসছ — একদিন আমাকেও প্রচণ্ড ভালবাসবে। ভালবাসা নির্ভর করে ভালবাসার ক্ষমতার উপর।'

'তাও ঠিক।'

'একটা কথা কি জান কণা, ভালবাসতে হলে ভালবাসার উপকরণ লাগে। ক্ষুধার্ত পেটে ভালবাসা যায় না। আমার কাছে ভালবাসার উপকরণ আছে। আমি তোমাকে নিয়ে কি করব জান?'

'কি করবেন?'

'জোছনা রাত্রিতে তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবো শহর থেকে দূরে। আশি, নব্বুই, একশ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চলবে। হাওয়ায় উড়বে তোমার চুল।'

'আমরা কোথায় যাব?'

'তুমি যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাব।'

'আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি — আপনি আমাকে সমুদ্র দেখাবেন?'

'অবশ্যই দেখাব। তুমি চাইলে সমুদ্রের কোন এক প্রবাল দ্বীপে তোমার জন্যে ঘর বানিয়ে দেব। তুমি কি চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'শোন কণা, তোমার স্বামীর এত ভালবাসার দরকার নেই। আমার দরকার। আমার প্রচুর ভালবাসা দরকার।'

কণা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নার্স এসে বিরক্ত মুখে বলল, আপনি এখানে? আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আসুন ভেতরে আসুন। ডাক্তার এসে গেছেন। ফরম ফিলাপ করেছেন?

কণা শুকনো গলায় বলল, জ্বি।

'আসুন তাহলে।'

কণা ক্লান্ত গলায় বলল, চলুন।

নার্স বলল, ভয় পাবেন না। ভয়ের কিচ্ছু নেই।

কণা বলল, আমি ভয় পাই না।

টেবিলের উপরে টিফিন কেরিয়ার থাকার কথা।

টিফিন কেরিয়ার নেই। আতাহার ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে এগারো মিনিট। এত রাতে নিশ্চয়ই টিফিন কেরিয়ার নিয়ে কেউ আসবে না। খাবার পাঠাতে কি ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক না। ধরে নেয়া যেতে পারে আতাহারের বড় মামার বাড়িতে দৈনন্দিন কাজের একটা অলিখিত তালিকা আছে। টিফিন কেরিয়ারে করে আতাহারকে খাবার পাঠানোর কাজটা তালিকায় একেবারে শেষের দিকে। যার উপর দায়িত্ব সে সম্ভবত জ্বরে পড়েছে। কিংবা ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গেছে।

বেছে বেছে আজকের দিনেই ক্ষিধেয় আতাহারের নাড়িভুড়ি উল্টে আসছে। দোকানপাট এখনো কিছু কিছু খোলা। গোটা দুই কলা কয়েকটা বিসকিট এবং এক কাপ চা খেয়ে এলে হয়। সেটাও সম্ভব না। পকেটে কিচ্ছু নেই।

আজ নিয়ে তিন দিন সে শূন্য পকেট নিয়ে ঘুরছে। একটা লাভ হয়েছে সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আজ সারা দিনে মাত্র দু'টা সিগারেট খাওয়া হয়েছে। তৃতীয় সিগারেটটা পাঞ্জাবির পকেটে আছে। রাতের খাবার পর আয়েশ করে বিছানায় শুয়ে ধরাবে এমন পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ আয়েশ করে সিগারেট ধরানোটা করা যাবে। প্রথম অংশ খাওয়া দাওয়া বাদ দিতে হবে।

কোন একটা দোকানে গিয়ে দরদাম করে দু'টা কলা কিনে সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে ছিলে খেয়ে ফেলা যায়। কলা খাওয়া হয়ে যাবার পরে পকেটে হাত দিয়ে আঁৎকে উঠে বলতে হবে — সর্বনাশ 'মানিব্যাগ গন'। এই সব কাজ মজিদ ভাল পারত। তার অভিনয় প্রতিভা ছিল তুলনাহীন। তার কাব্য প্রতিভাও তুলনাহীন। সে এখন কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসিত। তার বিয়ের কার্ড এসেছে। কার্ডের সঙ্গে ছোট চিরকুট —

দোস্ত,

কার্ড দেখে বুঝতে পারছিস বিয়ে করছি। খবর্দার বিয়েতে আসবি না। হাত জোড় করছি। সাজ্জাদও যেন না আসে। ওকে আমি বিয়ের কার্ডও পাঠাইনি। কবিতার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি, রক্তমাংসের কবিতা আমার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। প্রতিজ্ঞা করেছি দুই দেবীর আরাধনা করব না। পুরানো লেখাও সব ছিড়ে ফেলেছি। দোস্ত খবর্দার তোরা বিয়েতে আসবি না।

ইতি মজিদ

মজিদের বিয়ের কার্ডটা সুন্দর । সাধু ভাষায় লেখা ভাব গম্ভীর নিমন্ত্রণ পত্র।

"আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে আগামী ৮ই পৌষ ২৯শে রজব রোজ শুক্রবার বাদ জুমা এজিন কাবিনের দিন ধার্য্য হইয়াছে . . . "

আতাহার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষিধে ক্রমেই বাড়ছে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুয়ে থাকলে ক্ষিধে কম লাগে কার যেন কথা? মজিদের। ক্ষুধা বিষয়ে মজিদের অনেকগুলি আবিস্কার আছে। ক্ষুধা নষ্ট করা বিষয়ক আবিস্কার। তার মধ্যে আছে —

১। প্রচণ্ড ক্ষুধায় গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা চালাতে হবে। সামান্য বমি হলে সারাদিনের জন্য ক্ষিধে নষ্ট হবে।

২। প্রচুর লবণ দিয়ে আধ ছটাক বাদাম খেতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটা অবশ্যই খোসা শুদ্ধ।

৩। প্রচুর পরিমাণ চা এবং প্রচুর পরিমাণে জর্দাসহ পান খেলেও ক্ষিধে নষ্ট হবে। তবে এই পদ্ধতি বিপদজনক, এতে মুখের ভেতরের চামড়া পুড়ে যায় ।

প্রতিটি পদ্ধতি মজিদের পরীক্ষিত। এখন মনে হচ্ছে এ জীবনে তাকে আর ক্ষিধে নষ্ট করার কোন পরীক্ষা করতে হবে না। তার ক্ষিধে পেলেই সবুজ চুড়ি পরা স্নিগ্ধ দু'টা হাত তাকে ভাত বেড়ে দেবে। গোল গোল চাকা করা বেগুন গরম গরম ভেজে তার উপর এক চামচ গাওয়া ঘি ঢেলে দেবে। মজিদ তখন হয়ত রহস্য করে বলবে, ও বউ, আমার ডান হাতে কি যেন হয়েছে। হাত নাড়াতে পারছি না। কি সমস্যায় পড়লাম বল দেখি। বউ মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলবে, তুমি বড় যন্ত্রণা কর। আচ্ছা যাও হা কর, খাইয়ে দিচ্ছি। কে কোন ফাঁকে দেখে কি সব ছড়াবে।

ছড়াক যার যা ইচ্ছা — "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।"

'মানে কি?'

'মানে হল আমি তোমার দাসানুদাস।'

'হয়েছে দাস হতে হবে না। কপ কপ করে গিলবেনাতো। ভালমত চিবিয়ে খাও।'

'ভাত খাবার ফাঁকে আচার হিসাবে ছোট্ট একটা চুমু কি খেতে পারি?'

'ফাজলামী করবেনাতো। তোমার এইসব ফাজলামী অসহ্য লাগে।'

আতাহার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করে সবধানে টেবিলের উপর রাখল। তার জীবনের শেষ সঞ্চয় নষ্ট যেন না হয়।

পরিমল বাবু বললেন, ভাই একটা রিকোয়েস্ট — ঘরের ভিতর সিগারেট খাবেন

না। দয়া করে বাইরে গিয়ে খাবেন।

'জ্বি আচ্ছা। আজ আপনার কাশি এখনো শুরু হয়নি, ব্যাপারটা কি?'

পরিমল বাবু দুঃখিত চোখে তাকালেন। আতাহার বলল, কাশি শুরু না হওয়ায় সব কেমন এলোমেলো লাগছে। নাটক শুরু হয়ে গেছে অথচ আবহ সংগীত নেই।

'ভাই রসিকতা করবেন না। মানুষের যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি নিয়ে রসিকতা করতে নেই। ভগবান বিরক্ত হন । আজ আপনার খাওয়া দিয়ে যায় নি?'

'মনে হয় ভুলে গেছে। বাঙ্গালী বড়ই বিস্মৃতি পরায়ণ জাতি। এরা সব কিছু দ্রুত ভুলে যায়।'

'আপনার ক্ষিধে লাগেনি?'

'লেগেছে তবে ক্ষুধা জয়ের কিছু মন্ত্র আমার জানা আছে। আমার বন্ধু মজিদ এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে। মন্ত্রগুলির সেই হচ্ছে জনক। তার মন্ত্র ব্যবহার করে আপাতত সুখে নিদ্রা যাব। '

'আমার টিনের কৌটায় মুড়ি আছে, খাবেন ?'

'জ্বি–না।'

'খাবেন না কেন?'

'মুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে না বলে খাব না।'

'কি খেতে ইচ্ছা করছে?'

'চিকন চালের গরম গরম ভাত। খুব শক্তও না, আবার নরমও না। ধোঁয়া উড়ছে এমন গরম। পাতের পাশে চাক চাক করে কাটা বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজার উপর গরম ঘি এক চামচ ঢেলে দেয়া হয়েছে। ভাত এবং বেগুনের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে, ঘিয়ের গন্ধ। পাতের পাশে গাঢ় সবুজ রঙের একটা কাচা মরিচ।

পরিমল বাবু বিছানায় শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন, মুগ্ধ গলায় বললেন, আপনার কথা শুনেতো আমার নিজেরই আবার ক্ষিধে লেগে গেছে। বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত সত্যি সত্যি খাবেন? কাছেই আমার এক আত্মীয় থাকেন। তাঁকে বললে রেঁধে দেবেন।

'উনার কাছে কি বেগুন আছে?'

'বেগুন হাতীরপুলের কাঁচা বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাব। হাতীরপুলের কাঁচা বাজারে সারা রাত শাক–সব্জি পাওয়া যায়।'

'না থাক।'

'থাকবে কেন, চলুন। আপনার খুব ক্ষিধে লেগেছে আপনাকে দেখে মায়া লাগছে এই জন্য বলছি।'

আতাহার হাসি মুখে বলল, আমাকে দেখে যদি মায়া লাগে তাহলে দয়া করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট খাবার অনুমতি দিন।

'আচ্ছা খান। সিগারেট খান।'

আতাহার সিগারেট ধরাল। বালিশের কাছে এয়ার মেইল স্টিকার লাগানো

মনিকার চিঠি। প্রায় এক সপ্তাহ হল এই চিঠি খাম বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। খাম খোলা হয়নি। চিঠিও পড়া হয়নি। মনিকার চিঠি পড়তে ইচ্ছা করে না। চিঠিতে কি লেখা থাকবে জানা কথা। একগাদা হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর। হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর পড়ে কি হবে? আনন্দময় কোন চিঠি থাকলে পড়া যেত। মনিকা আনন্দের কিছু লিখতে পারে না। আতাহার নিজের অজান্তেই চিঠির খাম খুলল —

প্রিয় আতাহার,

তোদের ব্যাপারটা কি আমাকে বলবি? কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে কিছুটা জানাবি না? আমিতো তোর বোন। বাবা-মা তো আমাকে মেঘনা নদীর জল থেকে তুলে আনেন নি।

মায়ের কবর কোথায় হল? জানাজায় কত লোক হয়েছিল কিছুই আমাকে জানাবি না? প্রতি দিন তোদের কথা ভাবি — এই তার প্রতিদান। তোদের কথা এত বেশি ভাবি বলেই দিন রাত তোর দুলাভাইয়ের বাক্যবান সহ্য করতে হয়।

যাই হোক এখন তোকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। তোর এবং ফরহাদের ইমিগ্রেশন হয়েছে। তোদের নিজেদের তো কোন গরজ নেই দু'কপি ছবি পাঠানোর কথা বললে পাঠাবি না। তিনবার চারবার মনে করিয়ে চিঠি দিতে হবে। বার্থ সার্টিফিকেটের মত সামান্য সার্টিফিকেট জোগার করতে তোদের লাগে তিন মাস। আল্লাহর অসীম মেহেরবানী এখানে একজন ভাল লইয়ার পেয়েছিলাম। উনি প্রচুর ডলার নিয়েছেন, কিন্তু কাজ ভাল করেছেন।

তোরা প্রথম কিছুদিন এসে আমার এখানেই থাকবি তারপর নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিবি। লোকে যে বলে আমেরিকায় পথে-ঘাটে ডলার উড়ে বেড়ায় ধরতে জানলেই হল, কথাটা মিথ্যে না। সাউথ ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক আমেরিকায় এসে এক অফিসে জেনিটারের চাকরি নিলেন। মেঝে ঝাঁড়ু দেন। কমোড পরিষ্কার করেন। পাঁচ বছরের মাথায় ভদ্রলোক মিলিওনীয়ার হয়েছেন। তাঁর বেশ কয়েকটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। নাম হল 'কাপ্পাস ইটারি।' ভদ্রলোকের নাম হরিকাপ্পা। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ভদ্রমহিলা অতি মিশুক। তিনি তাঁর স্বামীকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

এক হাজার ডলারের একটা ব্যাংক ড্রাফট পাঠালাম। তোদের এখানে ডলার এখন কত করে? চল্লিশ করে না? যদি চল্লিশ করে হয় তাহলে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা পাবি। এই টাকাটা তোদের দুই ভাইকে আমি ধার হিসেবে দিচ্ছি। আমেরিকা এসে শোধ করবি। এবং টাকার ব্যাপারটা যেন কোন ক্রমেই তোর দুলাভাই না জানে। টাকাটা দিয়ে তোরা ভালমত জামা কাপড় বানিয়ে আনবি। টিকিট আমি পিটিএ করে পাঠাব। ভাল কথা, আমার জন্যে ভাল কাসুন্দি আনতে পারবি? ক'দিন ধরে হঠাৎ কাসুন্দি দিয়ে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছা

করছে। এখানে 'শ্যাড' নামের এক ধরনের মাছ পাওয়া যায়। আমাদের ইলিশ মাছের মত, তবে স্বাদ কম। তোদের খাওয়াব। আমরা এখন আর ডিফারেন্স ধরতে পারি না। তোরা নিশ্চয়ই পারবি।

ভাল কথা, মা-বাবা এই দু'জনের কবরই আমি বাঁধাতে চাই। কালো গ্রানাইট পাথরে বাঁধাতে কত খরচ পড়বে আমাকে জানাবি। কবে দেশে আসব, তাতো জানি না। এলে যেন মা'র কবরের একটা চিহ্ন দেখতে পাই।

ইতি তোর
মনিকা আপু

এক হাজার ডলারের ব্যাংক ড্রাফটটা আতাহার ঘুরিয় ফিরিয়ে দেখল। সামান্য একটা কাগজ। যে কাগজে নগদ মূল্যে অনেক খানি সুখ কেনা যায়।

পরিমল বাবুর কাশি শুরু হয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমেরিকায় গেলে ক্যাসেটে পরিমল বাবুর কাশি রেকর্ড করে নিয়ে যেতে হবে। ঘুমুবার আগে কাশি না শুনলে ঘুম হবে না।

খক খক খকর খক। খু খু খু — খকর খকর খকর — হ হ হ খক খক খক। কাশি চলছেই।

হোসেন সাহেব সাজ্জাদকে ড্রাগ এডিক্ট ট্রিটমেন্ট সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল সাজ্জাদ প্রবল আপত্তি করবে। তা সে করেনি। বাবার একটা কথাতেই রাজি হয়েছে। নিজেই আগ্রহ করে স্যুটকেসে কাপড় চোপড় নিয়েছে, বইপত্র নিয়েছে। ঘরে ছোট পোর্টেবল ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল না। ড্রাইভারকে পাঠিয়ে বায়তুল মোকাররাম থেকে কিনিয়ে আনিয়েছে।

হোসেন সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে ছেলে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর দুঃখে এবং লজ্জায় তিনি মরে যাচ্ছেন। সাজ্জাদের চোখে চোখ রেখে কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। তিনি কথা বলছেন অন্য দিকে তাকিয়ে।

'বাবা সাজ্জাদ!'

'জ্বি।'

'ড্রাগের সমস্যাটা তো বাবা মানসিক। তার জন্য তুমি লজ্জিত হয়ো না, বা দুঃখিত হয়ো না। দোষটা পুরোপুরিই আমার।'

সাজ্জাদ বলল, তোমার হবে কেন?

'আমি তোমাকে প্রপার গাইডেন্স দিতে পারিনি। তোমার মা পাশে ছিল না, একা একা তোমাদের মানুষ করতে গিয়ে ভুল করেছি।'

'তুমি কোন ভুল করনি বাবা। ভুল পুরোটাই আমার। একুশে পদকের মত 'শ্রেষ্ঠ পিতা পদক' বলে কোন জাতীয় পদক থাকলে অবশ্যই তুমি সেই পদক পেতে।'

হোসেন সাহেবের চোখ ভিজে উঠল। মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলালেন। সাজ্জাদ বলল, বাবা শোন, আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি সুস্থ হয়ে ফিরব। এবং তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে আমি ড্রাগ স্পর্শ করব না। তবে তোমার মৃত্যুর পর কি হবে আমি জানি না।

'তুই চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হচ্ছিস এটা কাউকে জানানোর দরকার নেই।'

'জানালেও কোন ক্ষতি নেই বাবা। শরীরের অসুখের কথা যেমন জানানো যায়, মনের অসুখের কথাও জানানো যায়।'

'দরকার কি?'

'তুমি জানাতে না চাইলে জানিও না।'

'যে সাইকিয়াট্রিস্ট তোর চিকিৎসা করবেন তাঁর নাম রুবিনা। রুবিনা হক। খুব নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'বুঝলে কি করে নাম করা?'

'আমেরিকার সেন্ট পল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিস্ট বিভাগে ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি খুব ইমপ্রেসড। তোর যে সব সমস্যা তাঁকে খোলাখুলি বলবি। ডাক্তার এবং উকিল এদের কাছে কিছু লুকাতে নেই।'

'আমি কিছুই লুকাব না। উনি যা জানতে চাইবেন আমি বলব।'

'জানতে না চাইলে নিজে থেকে বলবি। হয়ত কোন একটা জরুরি পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল।'

'ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট হলে ভুলবে না। যদি ভুলে যায় তাহলে বুঝতে হবে লো ক্যালিভার সাইকিয়াট্রিস্ট। তখন তার প্রশ্নের জবাব না দেয়াই ভাল।'

'তোর বন্ধু বান্ধব যদি তোর খোঁজ করে তাহলে আমি বলব তুই কিছুদিনের জন্যে রাঙ্গামাটি গিয়েছিস।'

'আচ্ছা।'

'ওদের কাউকে যদি তোর কিছু বলার থাকে তাহলে আমাকে বলে যা। আমি বলে দেব।'

'কাউকে কিছু বলতে হবে না। শুধু মজিদের বিয়ে হচ্ছে ৮ই পৌষ। বিয়েতে দামী গিফট পাঠাবে। দাওয়াতের কার্ড দিয়ে যাচ্ছি — সেখানে ঠিকানা আছে।

'কি গিফট পাঠাব?'

'দামী একটা শাড়ি আর একসেট রবীন্দ্র রচনাবলী। মজিদ সব সময় বলতো তার টাকা হলে সে এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলী কিনবে।'

'আচ্ছা আমি পাঠিয়ে দেব। তবে আমার ধারণা ৮ই পৌষের আগেই তুই সুস্থ হয়ে ফিরে আসবি।'

'আমার সে রকম মনে হয় না বাবা।'

হোসেন সাহেব একাই সাজ্জাদকে চিকিৎসা কেন্দ্রে রেখে এলেন। নীতুকে সঙ্গে নিলেন না। তাঁর মনে হল এইসব জায়গায় মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ঠিক না। গাড়িতে ফেরার পথে তিনি খুব কাঁদলেন।

রুবিনা হকের বয়স চল্লিশের উপরে — তাকে দেখে তা মনে হয় না। বয়সের একমাত্র ছাপ তাঁর চুলে। কানের পাশের চুল সাদা হয়ে আছে। তিনি সেখানে রঙ দেননি। কানের পাশে চুলগুলি কালো করে তিনি যদি চোখ থেকে ভারী চশমাটা খুলে ফেলতেন তাহলে তাঁকে কিশোরীদের মত দেখাতো। তিনি তা জানেন। কিশোরী মনস্তত্ত্ববিদ রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এই তথ্যটিও সম্ভবত তাঁর জানা। তিনি সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন আছেন?

সাজ্জাদ বলল, ভাল।

মহিলার শাড়ির রঙ হালকা সবুজ। কাঁধে সাদা রঙের চাদর জড়িয়েছেন। তাঁকে এই পোষাকেও চমৎকার লাগছে। শুধু গলার স্বর 'হাস্কি'। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা লেগেছে।

রুবিনা হক বললেন, আসুন আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলি।

সাজ্জাদ বলল, বলুন। সেসানটা হবে কেমন? আমি কি কাউচে শুয়ে থাকব?

'না। যেভাবে চেয়ারে বসে আছেন ঠিক সেইভাবে বসে থাকবেন। চা দিতে বলব?'

'বলুন।'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'জ্বি খাই।'

'তাহলে সিগারেট খেতে পারেন। আমি নিজেও সিগারেট খাই। তবে বাংলাদেশের পুরুষদের সামনে না। মেয়েরা সিগারেট খাচ্ছে এই দৃশ্য এই দেশের পুরুষরা অভ্যস্ত হয় নি। তারা একটা শক খায়। আপনাকে কোন শক দিতে চাচ্ছি না।'

সাজ্জাদ বলল, আমি এত অল্পতে শকড হই না। আপনি সিগারেট ধরান।

রুবিনা হক অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। টেবিলের ওপাশে ফ্লাস্ক ছিল। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন।

'সাজ্জাদ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আসুন আমরা একটা চুক্তি করি।'

'কি ধরণের চুক্তি।'

'আমার প্রশ্নের আপনি সত্যি জবাব দেবেন। সরাসরি জবাব দেবেন। ড্রাগ নিয়ে যারা অভ্যস্ত এই কাজটা তারা পারে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।'

'আপনার এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'আপনাকে রেসপনসিভ বলে মনে হচ্ছে। আপনার ভেতর দ্বিধা এবং কুণ্ঠার ভাবটা নেই। আমার কি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করব?'

'করুন।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি আপনি সত্যি কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ ধরে নিতে পারেন?'

রুবিনা হক সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সাজ্জাদের দিকে ঝুঁকে এলেন। ভারী এবং গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি কখনো মানুষ খুন করার কথা ভেবেছেন?

সাজ্জাদ হকচকিয়ে গেল। এই প্রশ্নের জন্যে সে তৈরী ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল প্রশ্ন হবে ড্রাগ সম্পর্কিত। সে কি ধরণের ড্রাগ নেয়। কতবার নেয়। কবে

থেকে শুরু করেছিল এইসব। ভদ্রমহিলা সে দিকে না গিয়ে আচমকা প্রশ্ন করলেন — আপনি কি কখনো মানুষ খুন করার কথা ভেবেছেন। ইন্টারেস্টিং।

সাজ্জাদ বলল, সব মানুষই জীবনে কখনো না কখনো খুন করার কথা ভাবে।

'আমি সব মানুষের কথা জানতে চাচ্ছি না। আপনার কথা জানতে চাচ্ছি। আপনি কি ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু ভেবেছেন, না পরিকল্পনাও করেছেন?'

'পরিকল্পনাও করেছি।'

'পরিকল্পনাটা বলুন।'

সাজ্জাদ হেসে ফেলল। রুবিনা হক বললেন, বুঝতে পারছি আপনার প্রাথমিক পরিকল্পানটা খুব হাস্যকর ছিল। নিশ্চয়ই শিশু বয়সের পরিকল্পনা। বলুন শুনি। আপনার সিগারেট নিভে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে বলুন।

'আমার একজন প্রাইভেট স্যার ছিলেন — নাম এজাজ উদ্দিন। ইংরেজী পড়াতেন। স্যারের অভ্যাস ছিল সারাক্ষণ নাকের লোম ছেড়া। তিনি নাকের লোম ছিড়তেন এবং তাঁর সামনে একটা সাদা কাগজে সেগুলি জমাতেন। আমাকে পড়ানো শেষ করে কাগজটা প্যাকেট করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।'

'আপনার কাছে দৃশ্যটা ভয়ংকর কুৎসিত লাগত?'

'জ্বি।'

'আপনি তাকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন?'

'জ্বি।'

'পরিকল্পনাটা বলুন শুনি।'

'আমার ফুটবলের একটা পাম্পার ছিল। আমি ঠিক করলাম কেরোসিন দিয়ে সেই পাম্পার ভর্তি করব। তারপর আড়াল থেকে পাম্পারে চাপ দিয়ে তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেব। তারপর একটা দেয়াশলাই জ্বেলে কাঠিটা তার গায়ে ফেলে দেব।'

'আপনার বয়স তখন কত?'

'আমি তখন সিক্সে পড়ি।'

'পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি কেন?'

'স্যার চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন।'

'পরের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।'

'কণা নামের একটা মেয়ে আছে আমি তার স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা করি।'

'পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।'

'খুব সহজ পরিকল্পনা — জটিল কিছু না। আমি খুব তীব্র কিছু বিষ জোগাড় করে কণাকে দিয়ে আসি। তাকে বলে দেই সে যেন কোন না কোন ভাবে তার

স্বামীকে খানিকটা খাইয়ে দেয়।'

'কণা রাজি হয়?'

'সে শিশিটা হাতে নিয়ে খুব হাসে। হাসি দেখে মনে হচ্ছিল সে রাজি।'

'সে যে রাজি না সেটা কখন বুঝলেন?'

'পরের বার তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সে বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।'

'মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? সে খুব রূপবতী?'

'না, খুব রূপবতী না। চেহারায় আকর্ষণ ক্ষমতা অবশ্যি আছে। . . .'

'কেন তাকে বিয়ে করতে চান এটা নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন?'

'জ্বি-না।'

'ব্যাপারটার পেছনে কি প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করছে? আপনার মা, আপনার বাবাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে . . . এই জাতীয় কিছু।'

'হতে পারে।'

'আপনার কি বন্ধু-বান্ধব আছে?'

'না।'

'না কেন?'

'বেশী দিন কাউকে আমার ভাল লাগে না।'

'কেন লাগে না।'

'ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নশ্রেণীর মনে হয়। ওদের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাই না।'

'মানুষকে চমকে দিতে আপনার ভাল লাগে?'

'লাগে।'

'আপনার শখ কি?'

'আমার কোন শখ নেই।'

'আপনার বাবার কাছে শুনেছি মুখোশ সংগ্রহ করা আপনার হবি।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'মাঝে মাঝে আপনি কি মুখোশ পরে চুপচাপ বসে থাকেন?'

'জ্বি।'

'আপনি কি জানেন আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'জানি।'

'আমাদের সাইকোলজির ভাষায় এই রোগের একটা নাম আছে। আপনি নামটা জানেন?'

'Antisocial Psychopath'

'এই বিষয়ে আপনার পড়াশোনা আছে?'

'জ্বি আছে। আমার প্রিয় বিষয় — কবিতা এবং সাইকোলজি।'

'আমাকে একটা কবিতা শুনানতো।'

সাজ্জাদ চোখ বন্ধ করে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করল,

> You know Orion always comes up sideways .
> Throwing a leg up over our fence of mountains.
> And rising on his hands, he looks in on me
> Busy outdoors by lantern-light with something
> I should have done by daylight, and indeed, . .

'কার কবিতা?'

'রবার্ট ফ্রস্ট।'

'রবার্ট ফ্রস্ট কি আপনার প্রিয় কবি?'

'না — আমার অপ্রিয় কবি।'

'অপ্রিয় কেন? যে সব কবিতা আপনার লেখার কথা সে সব কবিতা উনি লিখে ফেলেছেন বলে?'

'হ্যাঁ।'

সাজ্জাদ হাসল। মহিলার বুদ্ধি তাকে চমৎকৃত করছে। এর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। জন্মগতভাবেই তারা চাপা। এরা সহজ ভাবে কিছু বলবে না। বুদ্ধিমতি মেয়েদের বেলায় এই ব্যাপারটি আরো তীব্র। তারা পুরুষদের সঙ্গে কখনো বুদ্ধির খেলা খেলবে না। নিজের বুদ্ধি, মেধা ও মনন চাপা দিয়ে রাখবে। মেয়েরা অন্যদের কাছে নিজেদের সরল সহজ হিসেবে দেখাতে ভালবাসে।

'সাজ্জাদ সাহেব।'

'জ্বি।'

'কণার হাতে বিষের শিশি দিয়েছেন, এই কথাটা আপনার বানানো? তাই না?'

'জ্বি বানানো — আমি কণাকে বলেছিলাম আমি তোমাকে বিষ দিয়ে যাবো। তুমি তোমার স্বামীকে খাইয়ে দিও। শুনে সে খিলখিল করে হেসেছিল। আমি তার দু'দিন পরে সত্যি সত্যি বিষের কৌটা নিয়ে যাই — তখন আর তাদের পাইনি। এবার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।'

'হ্যাঁ এবার সত্যি কথা বলেছেন। আপনার মা যখন আপনার বাবাকে ছেড়ে যান তখন আপনার বয়স কত?'

'ছ' সাত বছর হবে। ঠিক বলতে পারছি না।'

'সেই সময়কার স্মৃতিতো নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আপনার মা যাকে বিয়ে করেন তিনি আপনার বাবার বন্ধু?'

'জ্বি।'

'আপনার বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি আসতেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মা কি তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে গল্প করতেন?'

'হ্যাঁ।'

'দরজার ফাঁক দিয়ে আপনি কি কখনো উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন ভেতরে কি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, করেছি।

'যা দেখেছেন তাতে আপনার মনে প্রচণ্ড রাগ এবং ঘৃণা তৈরি হয়েছে।'

'আমি ছোট ছিলাম। কিছু বুঝতাম না।'

'তার পরেও প্রচণ্ড রাগ এবং ঘৃণা জন্মাতে পারে।'

'হ্যাঁ পারে।'

'আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার বর্তমান অবস্থার বীজ হচ্ছে শৈশব।'

'হতে পারে।'

'এখনতো আপনার বয়স হয়েছে, এখন কি আপনি আপনার মা'র ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারেন না? বাবা আপনার যতই প্রিয় হোন না কেন আপনার মা'র কাছে প্রিয় ছিলেন না। তাঁর যে সব অভাব ছিল আপনার বাবা সে সব অভাব মিটাতে পারছিলেন না। অসুখী একজন মহিলা সুখের সন্ধান করবে — এটা কি স্বাভাবিক না?'

'হ্যাঁ স্বাভাবিক।'

'আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?'

'না।'

'আপনার কি ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খাবেন? আমার সঙ্গে ভাল চকলেট কেক আছে।'

'কেক না — অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বলুন কি খেতে চান?'

সাজ্জাদ শীতল গলায় বলল, একটা টিকটিকি খেতে চাই। মিডিয়াম সাইজের একটা টিকটিকি।

রুবিনা হকের মুখের ভাব বদলাল না। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছেন। যেন তিনি সাজ্জাদের কথা শুনতে পান নি।

সাজ্জাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার হাতের মুঠি বন্ধ। মনে হচ্ছে সে অনেক কষ্টে রাগ সামলাচ্ছে।

নীতু তার বাবাকে ডাকতে এসে দেখল তিনি জবুথবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর মাথা নিচু। বেশ শীত পড়েছে। কিন্তু তিনি বসে আছেন পাতলা একটা গেঞ্জি গায়ে।

মাথার উপর ফ্যানটাও ফুলস্পীডে ঘুরছে। নীতু বলল, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

হোসেন সাহেব বললেন, না।

'তাহলে এসো। ভাত খাবে এসো।'

হোসেন সাহেব বললেন, ভাত খাব নারে মা।

'ভাত খাবে না কেন?'

'মনটা ভাল নেই।'

'রুটি বানিয়ে দেব?'

'না। কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'একদম কিচ্ছু খাবে না তা কি করে হয় বাবা? একটা কলা খাও, আর এক গ্লাস দুধ এনে দেই?'

'আচ্ছা দে।'

নীতু কলা এবং দুধ এনে দেখল তার বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নীতুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তাহলে তাকে খুব অসহায় লাগে। নীতু বাবার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ভাইয়ার জন্য কি মনটা খারাপ লাগছে বাবা?

'না।'

'তাহলে কি জন্য মন খারাপ লাগছে?'

হোসেন সাহেব চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমার জন্যে তোদের সবার জীবন উলট পালট হয়ে গেল এই জন্য মন খারাপ লাগছে।

'তোমার জন্যে হবে কেন?'

'অবশ্যই আমার জন্যে। আমি তোদের ঠিকমত মানুষ করতে পারি নি। ঠিকমত মানুষ করলে এই সমস্যা হত না। তোদের দু'জনের জীবনই ধ্বংস করে দিয়েছি। সব সময় আমার নিজেকেই দোষী মনে হয়।'

নীতু বলল, শুধু শুধু কষ্ট পেও না বাবা। তুমি কারো জীবন নষ্ট করনি। আরেকটা কথা বাবা তুমি বার বার দু'জনের জীবন নষ্ট করে দিয়েছি এসব বলছ কেন? ভাইয়ার জীবন খানিকটা এলোমেলো হয়েছে — কিন্তু আমারতো কিছু হয়নি। আমি ড্রাগও ধরিনি, মাথা খারাপের মত আচরণও করছি না।

হোসেন সাহেব ধরা গলায় বললেন, তুইও করছিস। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল, দাওয়াতের চিঠি চলে গেল তখন তুই সব বাতিল করে দিলি। এটাতো মা এক ধরনের অসুস্থতা।

নীতু বাবার হাতে হাত রেখে বলল, বাবা এরকম আর হবে না। তুমি আবার আমার জন্যে একটা বিয়ে ঠিক কর, দেখবে আমি হাসি মুখে বিয়ের আসরে গিয়ে বসব।

হোসেন সাহেব বললেন, আমার নিজের শরীরটা ভাল না। কয়েকদিন পরপর

বুকে ব্যথা হয়, তোদের বলি না। তোরা নার্ভাস হয়ে পড়বি। আমি বুঝতে পারছি আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। অথচ কিছুই গুছিয়ে যেতে পারলাম না। সব এলোমেলো। যত দিন যাচ্ছে ততই এলোমেলো হচ্ছে।

নীতু বলল, দুধটা খাও বাবা।

হোসেন সাহেব বাধ্য ছেলের মত দুধের গ্লাসে চুমুক দিলেন। বাবাকে দেখে নীতুর মনটা মায়ায় ভরে গেল। তার ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে এমন কিছু করে যা দেখে তার বাবার মনটা ভাল হয়ে যায়। তিনি যেন বুঝতে পারেন তাঁর সংসারটা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায় নি।

নীতু বাবাকে ঘুমুতে পাঠিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে প্যাডের কাগজে লিখল,

আতাহার ভাই,

দয়া করে আপনি কি এক্ষুণি একটু আসবেন?

ইতি নীতু

নীতু চিঠি খামে বন্ধ করল না। চিঠিতে এমন কিছু লেখা নেই যে খামের ভেতর আড়াল করে পাঠাতে হবে। খুব সহজ সরল আহ্বান।

নীতু চিঠি হাতে ড্রাইভারের খোঁজে গেল। ড্রাইভারকে বলে দিল চিঠিটা যেন সে আতাহারকে দেয় এবং যত রাতই হোক সে যেন আতাহারকে নিয়ে আসে। রাত তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও সে যেন অপেক্ষা করে।

নীতু বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে। যত রাতই হোক সে অপেক্ষা করবে। আতাহার যদি রাত তিনটাতেও আসে সে বসেই থাকবে। দেরীতে এলেই ভাল হয়, আতাহার ভাইকে কি বলবে তা সে গুছিয়ে নিতে পারবে। বেশি কিছু বলবে না। অল্প কয়েকটা কথা — 'আতাহার ভাই আমি সারাক্ষণ আপনার কথা ভাবি। আমি জানি আমার ভয়ংকর কোন অসুখ করেছে। আপনি আমার অসুখ সারিয়ে দিন।'

তার মুখে এই ধরনের অদ্ভুত কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে তাকাবেন তখন সে আতাহার ভাইয়ের হাত ধরে যা মনে আসে তাই বলবে। আগে থেকে কিছু ভেবে রাখবে না। তার যদি ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয় — কাঁদবে। অন্য কিছু করতে ইচ্ছে করলেও করবে। তাকে যদি সবাই পৃথিবীর সবচে খারাপ মেয়ে ভাবে তাতেও কিছু যায় আসে না। কিছু যায় আসে না। কিচ্ছু যায় আসে না। না — না-না।

নীতু বারান্দার বাতি নিভিয়ে রাখল। অন্ধকারই ভাল। অন্ধকারে এমন অনেক কিছু বলা যায় যা আলোতে বলা যায় না। শুধু একটাই সমস্যা অন্ধকারে সে আতাহার ভাইয়ের মুখটা দেখতে পাবে না। মুখ না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই — সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে। আজ রাতের জন্য সে হবে এক অন্ধ তরুণী।

ড্রাইভার রাত একটার দিকে ফিরে এসে জানালো — আতাহারকে সে খুঁজে পায়নি । সে আগে যেখানে থাকতো সেখানে নেই। এখন অন্য কোথায় যেন থাকে। কেউ বলতে পারে না কোথায়।

আতাহার কাল রাত থেকে পথে পথে ঘুরছে। নিজের ঘরে ফেরে নি। ফরহাদকে প্লেনে তুলে দিয়ে তার মনটা এত খারাপ হল যে ঘরে ফিরতে ইচ্ছো করল না। মনে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে কেউ ঘরে ফিরে না। সন্ধ্যাবেলা সব পাখি ঘরে ফিরে। কারণ পাখিদের মনে কষ্ট নেই। মানুষের মনে নানান ধরনের কষ্ট। তাই বুঝি সব মানুষ ঘরে ফেরে না।

ফরহাদ এয়ারপোর্টে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। তার গায়ে কমপ্লিট স্যুট। গলায় লালের উপর কাল ফুলের টাই। পায়ে চকচকে নতুন জুতা। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

আতাহার বলল, কাঁদছিস কেন?

ফরহাদ বলল, একা একা আমেরিকা যেতে ভয় লাগছে।

'ভয়ের কি আছেরে গাধা। নিউ ইয়র্কে নামবি। আপা এয়ারপোর্ট থেকে তোকে নিয়ে যাবে।'

'যদি না আসে?'

'আসবে না কেন? আসবেতো বটেই, না এলে এয়ারপোর্টে নেমে টেলিফোন করে দিবি।'

'ভাইয়া, তুমি আমেরিকা যাবে না?'

'যাব, তুষারপাত দেখার জন্যে বেড়াতে যাব। দেশ ছেড়ে যাব না। আমি হচ্ছি এই দেশের একজন কবি। কবিরা দেশের আত্মা। দেশ ছেড়ে আত্মা যাবে কি ভাবে? আমি কি করে যাই।'

'তুমি সারা জীবন পথে পথে ঘুরবে? এর বাড়িতে খাবে, ওর বাড়িতে ঘুমাবে।'

'তা না। কিছু দিনের মধ্য একটা চাকরি জোগার করব। তারপর যথা সময়ে বিয়ে টিয়ে করে গৃহপালিত হয়ে যাব।'

'তোমাকে চাকরি কে দেবে?'

'ময়না ভাই। খুব ওস্তাদ লোক — অনেক কানেকশান। তার সঙ্গে মোটামুটি কথাও হয়েছে। উনি চাকরির ব্যবস্থা করলেই শুভ বিবাহ। তোকে কার্ড পাঠিয়ে দেব। চলে আসবি।'

'কাকে বিয়ে করবে?'

'এখনো ঠিক করিনি। খুব সম্ভব নীতুকে। সমস্যা একটাই, মেয়েটা আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না।'

'দু' চোখে দেখতে পারে না এমন একটা মেয়েকে তোমার বিয়ে করার দরকার কি?'

'এখন দেখতে পারে না — তবে আমার ধারণা আমার সঙ্গে ভালমত মিশলে আমাকে সে পছন্দই করবে। মানুষ হিসেবে আমি কি খারাপ?'

'ভাইয়া, তুমি অসাধারণ।'

'এরকম কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছিস কেন? চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে কথা বল। চোখের পানিতে তোর টাই ভিজে গেছে। টাইয়ের রঙ কাঁচা হলে রঙ ওঠে যাবে। সবাই তোকে দেখছে। প্লেন লেট আছে। চা খাবি? আয় চা খাই।'

'চল।'

দু' ভাই চা খেতে ঢুকল। আতাহার মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল যে মিলি ঠাকুরগাঁ থেকে আসতে পারে নি। মিলির শাশুড়ি অসুস্থ, মরনাপন্ন। মিলি বিদায়ের সময় উপস্থিত থাকলে এক হাঁটু চোখের পানিতে এয়ারপোর্ট ডুবে যেত।

আতাহার বলল, ফরহাদ তুই এরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছিস কেন?

'জুতাগুলি খুব টাইট হয়েছে।'

'টাইট হলে জুতা ফেলে দে। আমার স্যান্ডেল পরে চলে যা।'

'সত্যি স্যান্ডেল পরে যাব?'

'হ্যাঁ যা।'

'সবাই তাকিয়ে থাকবে। স্যুট পরেছি, পায়ে স্যান্ডেল।'

'তাহলে থাক।'

রেষ্টুরেন্টে ফরহাদ সারাক্ষণই একহাতে তার ভাইয়ের হাত ধরে থাকল। সেই হাত ছাড়ল শুধু ইমিগ্রেশন এরিয়ায় ঢোকার আগে।

আতাহার বলল, দাঁড়িয়ে থাকিস না — ঢুকে যা।

'আমার প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত ভাইয়া তুমি কিন্তু এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাবে না।'

'না, যাব না। তুই রুমাল দিয়ে চোখটা ভালমত মোছ।'

ফরহাদ রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তাতে চোখের পানির কেন উনিশ বিশ হল না। টপ টপ করে চোখের পানি পড়ছেই।

আতাহার বৃটিশ এয়ার ওয়াজের বিমান আকাশে না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। বিমান আকাশে মিলিয়ে যাবার পর মনে হল — বাসায় ফিরেই বা কি হবে। একটা রাত এয়ারপোর্ট কাটিয়ে দেয়া যায় না? অবশ্যই যায়। এয়ারপোর্টে চায়ের দোকান আছে। সে দোকান নিশ্চয়ই সারারাত খোলা থাকে। দোকানের সামনে কোন একটা চেয়ারে বসে মানুষের মনের একটা জটিল রহস্য নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। রহস্যটা হচ্ছে — ফরহাদ চলে যাওয়ায় তার এত খারাপ লাগছে কেন? তার মা মারা গেছে, বাবা মারা গেছে — কিন্তু সে এতটা কষ্টতো পায়নি। তার ভাই, যার

সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললেই হয় — তার জন্যে এতটা খারাপ লাগার মানে কি? এত জটিল কেন মানুষের মন?

এয়ারপোর্টে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। হেঁটে হেঁটে ঢাকার দিকে রওনা হলে কেমন হয়? একসময় না একসময় ঢাকায় নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। আর পৌঁছতে না পারলেও ক্ষতি নেই — মানুষের যাত্রা কখনো শেষ হয় না। সে চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। মৃত্যুর পরেও সে যাত্রা শেষ হয় না — তখন শুরু হয় অন্য এক যাত্রা।

হাঁটতে শুরু করে আতাহারের মনে হল সে আসলে ঢাকায় যেতে চাচ্ছে না। মন টানছে না। অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। সেই অন্য কোথাওটা আসলে কোথায় তা তার জানা নেই।

গণি সাহেব আতাহারকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। অবাক হয়ে বললেন, কি হয়েছে তোমার?

আতাহার বলল, কিছু হয়নিতো।

'তোমাকে লাগছে মরা মানুষের মত। ইজ এনিথিং রং?'

'জ্বি না।'

'আসছ কোত্থেকে?'

'এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছিতো মনে এজন্যই ক্লান্ত লাগছে।'

'এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে আসার দরকার কি? অর্থহীন পাগলামী তোমরা কেন কর? ক্রিয়েটিভিটি এবং পাগলামীকে তোমরা সমার্থক করে ফেলেছ। এটা ঠিক না আতাহার। ক্রিয়েটিভিটি এবং পাগলামী দু'টা দু'জিনিস। এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে কেন এলে এটা আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি?'

আতাহার কিছু বলল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আবার উঠে চলে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। শীত সংখ্যায় তোমার চারটা কবিতা এক সঙ্গে যাচ্ছে। শীত সংখ্যা বের হলে তোমাকে চমকে দেব বলে আগে খবর দেইনি। এখন তোমার অবস্থা দেখে আগে ভাগেই বললাম। কবিতাগুলি ভাল হয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। দু' এক জায়গায় ছন্দ ভুল আছে। মাত্রা এদিক ওদিক করলে ঠিক হয়ে যায় --- তবে আমি হাত দেইনি।'

'হাত দেননি কেন?'

'একদিন যদি খুব বিখ্যাত কেউ হয়ে যাও তখন তোমার কবিতায় হাত দেয়ার জন্যে দেশের লোক আমার উপর রাগ করবে। এই ভয়েই হাত দেইনি।'

আতাহারের মন গভীর আনন্দে আচ্ছন্ন হবার কথা। তা হচ্ছে না। বড় ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এই চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভাল লাগত। মাথার দু' পাশের শিরা দপ দপ করছে। জ্বর হবার আগে কি এ রকম হয়? অনেক দিন তার অসুখ বিসুখ হয় না। অসুখের আগের শারীরিক ব্যাপারগুলি সে জানে না।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'বাসায় চলে যাও। টেক রেস্ট। ইয়াং ম্যান, শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো। রবীন্দ্রনাথ শরীর ঠিক রাখার জন্যে আশি বছর বয়সেও চিরতার পানি খেতেন। হালকা ব্যায়াম করতেন। রিমেম্বার দ্যাট। টাকা লাগবে? নাও, পঞ্চাশটা টাকা রেখে দাও।'

আতাহার হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তার কোন অস্বস্থি বা লজ্জাবোধ হল না। গণি সাহেব বললেন — কোন দিন যদি অতি বিখ্যাত হও তাহলে এই সব খুটি নাটি মনে রাখবে। জীবনী লেখার সময় অবশ্যই আমার কথা লিখবে। লিখবে — প্রথম জীবন বড় অর্থ কষ্টে কেটেছে। সে সময় সুবর্ণ সম্পাদক জনাব আব্দুল গণি আমাকে বিভিন্ন সময়ে অর্থ সাহায্য করেছেন। হা হা হা।

আতাহার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল — আপনি নিজে কি জানেন, মানুষ হিসেবে আপনি প্রথম শ্রেণীর।

গণি সাহেব বললেন, না জানি না। তোমার কাছে প্রথম শুনলাম। মানুষ হিসেবে আমি প্রথম শ্রেণীর না। তোমার কাছে মনে হচ্ছে, কারণ তোমাকে উপরে ওঠার জন্যে আমি সাহায্য করেছি। সিঁড়ি কেটে দিচ্ছি। সিঁড়ি সবার জন্যেই কাটা হয়। সবাই সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে না। তোমার বন্ধু মজিদ পাড়ল না। লাফিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই হুমকি খেয়ে পড়ে গেল। সাজ্জাদও পাড়ল না। শুনেছি ও কোন এক চিকিৎসা কেন্দ্রে আছে। কথাটা কি সত্যি?

'জ্বি।'

'একদিন আমাকে নিয়ে যেও, ওকে দেখে আসব।'

'জ্বি, নিয়ে যাব।'

'ও এখন কেমন আছে?'

'ভাল না। নানান রকম জটিলতা দেখা দিয়েছে।'

গণি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

আতাহার রাস্তায় নামল। হাঁটতে গিয়ে লক্ষ্য করল সে ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। বাইরের রোদ তীব্র মনে হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। পানির পিপাসাও হচ্ছে। সে আবদুল্লাহ সাহেবের লৌহ বিতানে ঢুকল ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানির জন্যে।

পানি খুব ঠাণ্ডা হতে হবে। খুব ঠাণ্ডা।

আবদুল্লাহ দরাজ গলায় বললেন, এতদিন পর আমার কথা মনে পড়ল। আসুন আসুন। আপনাকে এমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে কেন?

আতাহার বলল, বুঝতে পারছি না কেন?

আবদুল্লাহ ঝুঁকে এসে বললেন, আমার গল্পটা কি আজ শুনবেন? আজ আপনাকে শুনাতে পারি।

আতাহার প্রায় বলেই ফেলছিল - কিসের গল্প? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালো। মনে পড়ল আবদুল্লাহ তার প্রেমের গল্প শুনাতে চেয়েছিলেন। আতাহার প্রেমের গল্প শোনার জন্যে কোন আগ্রহ অনুভব করছে না। বাঙালীর সব প্রেমের গল্পই জলো ধরনের হয়। চিঠি লেখালেখি, হাত ধরাধরি, তারপর এক সময় বাবা-মা জাতীর কারো হাতে ধরা পড়ে যাওয়া। গৃহত্যাগ এবং আবারো গৃহে প্রত্যাবর্তন। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে মধুর মিলন। বিশ ভাগ — ট্রাজেডি। নায়ক-নায়িকা কিছুদিন বিরহ ব্যথায় কাতর — তারপর আবার স্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তন। আবার নতুন কারো সঙ্গে চিঠি চালাচালি।

লৌহ বিতানের মালিক এই সাধারণ ফর্মুলার বাইরে যাবেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

আবদুল্লাহ বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি ভুলে গিয়েছেন।

'ভুলি নি।'

'আজ তাহলে প্রেমের গল্পটা শুনবেন?'

'জ্বি। আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা। ভাই, গল্প শুরু করার আগে খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব। গ্লাস যত বড় হয় তত ভাল। আমার টেন্টেলাসের মত জল তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'জ্বি না শরীর খারাপ না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে — আপনার গায়ে জ্বর। বেশ ভাল জ্বর। মুখ লাল হয়ে আছে। দেখি, মাথাটা এগিয়ে আনুনতো, জ্বর দেখি।'

আতাহার তার মাথা এগিয়ে দিল। আবদুল্লাহ সাহেব জ্বর দেখলেন। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর হল না। তিনি তাঁর জরাগ্রস্ত বুড়ো কর্মচারীকে বিছানা করতে বললেন। আরো কি সব বললেন - আতাহারের মাথায় কিছুই ঢুকল না। সব কিছুই তার কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। যে তীব্র পানির তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল - সেই তৃষ্ণা নেই। শরীর কেমন যেন হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে কোন পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে সে মাটিতে পড়বে না। আকাশে উড়তে থাকবে।

'আতাহার সাহেব!'

'জ্বি।'

'শুয়ে পড়ুন।'

'শুয়ে পড়ব কেন? আপনার গল্প শুনব না?'

'আপনার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বর এত বেশি যে থার্মোমিটার দিয়ে দেখতেও ভয় লাগছে। যান, শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি।'

'গল্প শুনব না?'

'শুনবেন। শুনবেন, গল্প অবশ্যই শুনবেন। খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। আপনাকে না শুনালে কাকে শুনাব? গল্পের একটা অংশ বলব আমি আরেকটা অংশ বলবে আমার স্ত্রী। আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর নাম বলেছিলাম, আপনার কি মনে আছে?'

'জ্বি না।'

'আপনার জ্বর খুব বেশি। জ্বর কমলে অবশ্যই মনে পড়বে। যান, শুয়ে পড়ুন। আমি হাত ধরে আপনাকে শুইয়ে দিতে পারলে ভাল হত। সেটা সম্ভব না। আমি বরং আমার স্ত্রীকে ডাকি। আমি কি আপনাকে বলেছি আমার স্ত্রীর ধারণা আপনি একজন অভিনেতা?'

'জ্বি না।'

'আমি বলেছি — আপনার মনে নেই। যাই হোক, জ্বরটা কমলেই মনে পড়বে। আমার ধারণা ডাক্তার আপনাকে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখতে বলবে।'

আতাহার তাকিয়ে আছে। আবদুল্লাহর চোখ মুখ কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। পানির তৃষ্ণা ফিরে এসেছে — কিন্তু আবদুল্লাহ নামের লোকটা তাকে পানি দিচ্ছে না। সেও গণি সাহেবের মত নানান কথা বলছে। অধিকাংশই অর্থহীন কথা। আতাহার ঘোরের ভেতর তলিয়ে গেল।

অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে আতাহারের মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মেয়েটি সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু সে খুব চেনা চোখে আতাহারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে চাপা হাসি। মেয়েটির মাথা ভর্তি চুল। শাড়ির রঙ কমলা। কমলা রঙের শাড়ির ফাঁক দিয়ে কাল চুল বের হয়ে এসেছে। বাহ্, রঙের কি সুন্দর কম্বিনেশন।

আতাহার বলল, কে?

'আমি নীতু।'

আতাহার হতাশ গলায় বলল, ও আচ্ছা, নীতু।

সে জানে তার শরীর খুবই খারাপ। তার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। তাই বলে সে নীতুকে চিনবে না? তার কি হেলুসিনেশন হচ্ছে?

রূপবতী মহিলাটি বলল, আপনাকে আমরা একটা খুব ভাল ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

'আমি কোন চিন্তা করছি না।'

'আপনার জ্বর কত জানেন? একশ' পাঁচ।'

'আতাহার মনে করার চেষ্টা করল থার্মোমিটারে কত দাগ পর্যন্ত থাকে। একশ দশ? মনে পড়ছে না।'

'আমরা চিন্তা করছি। আমরা ভয়ংকর চিন্তায় পড়ে গেছি।'

'চিন্তা করবেন না।'

'আপনার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা দিন। তাদের খবর দেই।'

'তাদের খবর দেয়ার দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে। আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার শরীর কতটা খারাপ। নীতুর টেলিফোন নাম্বার দিন। উনাকে আসতে বলি।'

আতাহারের মাথা আবারো এলোমেলো হয়ে গেলো। এই মেয়েটি বলছে সে নীতু আবার সে নীতুর টেলিফোন নাম্বার চাচ্ছে। জ্বর একশ পাঁচ হলে কি সব কিছু এমন হয়? কথাবার্তা অর্থহীন লাগে?

'আতাহার সাহেব!'

'জ্বি।'

'নীতুর টেলিফোন নাম্বার কি আপনার মনে আছে?'

'জ্বি।'

'নাম্বারটা বলুন।'

আতাহার অনেক চেষ্টা করেও নাম্বারটা মনে করতে পারল না। তার যা মনে পড়ল তা হচ্ছে সে একটা লিফটে করে উঠছে। সেই লিফটে একটা মেয়ে উঠেছে। মেয়েটার নাম বেহুলা। লিফটটা হচ্ছে বেহুলার লোহার বাসর। আতাহার বিড় বিড় করে বলল, —

'কপাটহীন একটা অস্থির ঘরে তার সঙ্গে দেখা।
লোহার তৈরি ছোট্ট একটা ঘর।
ঘরটা শুধু উঠছে আর নামছে . . .'

তরুণী বললেন, কি বলছেন আপনি?

আতাহার ক্লান্ত গলায় বলল, কিছু বলছি না।

'নীতুর ঠিকানাটা কি বলবেন? ওদের বাসাটা কোথায়?'

আতাহার বাসার ঠিকানা জানে না। রোড নাম্বার কত, বাড়ির নাম্বার কত কিছুই না। শুধু বাড়িটা চেনে।

'আচ্ছা, আপনি শুয়ে থাকুন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

'আমি চিন্তা করছি নাতো।'

আতাহার চিন্তা করছে না। তার খানিকটা হাসি পাচ্ছে। হাসি পাবার কারণটাও অদ্ভুত। সে চোখের সামনে একজনকে দেখছে যে উঠবোস করছে। ডন বৈঠক দিচ্ছে। দাঁড়িওয়ালা একজন লোক — রবীন্দ্রনাথ না-কি? রবীন্দ্রনাথ ডন-বৈঠক দেবেন কেন? গণি সাহেব বলছিলেন আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একসারসাইজ করতেন। সেই কারণেই কি সে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে?

আতাহার হঠাৎ লক্ষ্য করল তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বেশ কষ্ট হচ্ছে। সে মারা যাচ্ছে নাতো?

অপূর্ব রূপবতী এক রমনী ঝুঁকে আছে তার দিকে। রমনীর মুখ একই সঙ্গে চেনা এবং অচেনা। কোথায় যেন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। জায়গাটা মনে পড়ছে না। হাসপাতালে নাতো? আচ্ছা, এই তরুণীর নাম কি হোসনা?

রমনী বলল, এ্যাম্বুলেন্স আনতে গেছে। এ্যাম্বুলেন্স এলেই আপনাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না।

আতাহার ক্লান্ত গলায় বলল, চিন্তা করছি না।

'আপনি তাকিয়ে থাকবেন না। চোখ বন্ধ করুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি কে?'

'আমি আপনার বন্ধু আবদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী।'

'ও।'

'আপনার নাম কি হোসনা?'

'জ্বি-না। আমার নাম নীতু।'

আতাহার চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করা মাত্র সে চলে গেলো প্রবল ঘোরের এক জগতে।

সেই রহস্যময় জগতে তার মাথায় একটা কবিতা তৈরি হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার সে কবিতা তৈরির ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এইতো প্রথম শব্দটা চলে এসেছে, হালকাভাবে ভাসছে। নাচের ভঙ্গিতে শব্দটা ঘুরছে — কি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে শব্দটা। শব্দটার গায়ে নানান বর্ণের পোষাক। শব্দটা ঘুরছে আর তার পোষাকের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার।

আতাহার আবার চোখ মেলল। রূপবতী মেয়েটা এখনো তার উপর ঝুঁকে আছে। ঘরে আরো লোকজন আছে। দিন না রাত্রি তা বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে বাতি জ্বলছে। এই বাড়িতে সে দিনে ঢুকেছিল — এখন রাত্রি। তার মানে কি? রূপবতী মেয়েটির নাম কি? লীলাবতী? তাকেতো লীলাবতীর মতই লাগছে। না ইনি লীলাবতী না। ইনার নাম নীতু। ইনি আবদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী। এদের দু'জনের খুব সুন্দর একটা প্রেমের গল্প আছে। গল্পটা তার শোনার কথা। শোনা হয় নি। খুব রূপবতীদের প্রেমের গল্পগুলি ভয়ংকর টাইপের হয়। ইনারটা কি ভয়ংকর?

মেয়েটি বলল, আপনার শরীর কি এখন একটু ভাল লাগছে?

'না। ভাল লাছে না। খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে আমি মারা যাব।'

মেয়েটি গভীর মমতায় আতাহারের মাথায় হাত রাখল। মেয়েটির হাত খুব ঠাণ্ডা। বেশ ঠাণ্ডা। কপালটা কেমন যেন করছে। তাকে একটা কথা বলা দরকার। আতাহার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, যদি মরে যাই তাহলে আপনি কি একটা কাজ করতে পারবেন?'

'বলুন কি কাজ?'

'নীতুকে একটা কথা বলবেন। ওকে বলবেন আমি যে দিনের পর দিন সাজ্জাদের পেছনে ঘুরতাম, ওদের বাড়িতে যেতাম, সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাশতা খাবার জন্যে চলে যেতাম, সেটা শুধুমাত্র ওকে দেখার জন্যে। অন্য কিছু না।'

মেয়েটি হাসল। বাহ্, মেয়েটার হাসিটাতো সুন্দর। আতাহার বলল, আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে ওকে কিছু বলার দরকার নেই। আপনার কি মনে থাকবে?

'থাকবে। আপনি নীতুর টেলিফোন নাম্বারটা মনে করার চেষ্টা করুন।'

আতাহার টেলিফোন নাম্বার মনে করার চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না। কবিতার একটা লাইন উঠে আসছে — আহ্ কি অপূর্ব পংক্তিমালা।

---

১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে জন্ম।

পেশা শিক্ষকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। তেইশ বছর ধরে লেখালেখি করছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের কিংবদন্তী পুরুষ। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক। নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র — আগুনের পরশমণি। ছবিটি ১৯৯৫-এর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। টিভিতে নাটক লিখছেন দীর্ঘদিন থেকে। যাত্রা শুরু এইসব দিনরাত্রি দিয়ে। তারপর এসেছে বহুব্রীহী, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত। জাপানের টেলিভিশন NHK অতি সম্প্রতি তাঁর উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে প্রচার করেছে।

নিভৃতচারী এই লেখক তিন কন্যা, এক পুত্র এবং স্ত্রী গুলতেকিনকে নিয়ে বাস করেন আপন ভুবনে। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট চরিত্র — হিমু। আবার কখনো মনে হয় — মিসির আলি। যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কে ঠিক করে বলুন তো! তিনি হেসে বলেন, আমি কেউ না। I am nobody.

Kobi by Humayun Ahmed

For More books & Muzic Visit www.MurchOna.com
Murchona forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com